সাম্যবাদ

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী জীবন ও সংগ্রামের কিছু দিক ৩ | যাদের শ্রমে শহর পরিষ্কার হয় তারাই সমাজে অস্পৃশ্য!! ৪ | ডুমুরিয়ায় লড়ছে কৃষকরা ৫ | আবারও নামতে হবে রাস্তায় ৮

wed: www.spbm.org বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র, সপ্তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, আগস্ট ২০১৯, মূল্য ৫ টাকা

লাগামছাড়া উন্নয়ন, বিপর্যস্ত জনজীবন

সমাজতন্ত্র : কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

একথা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, সমাজের বর্তমান কাঠামোটা আজকের শাসকশ্রেণী বুর্জোয়াদেরই সৃষ্টি। বুর্জোয়াশ্রেণীর যে বিশেষ উৎপাদনপদ্ধতি, যা

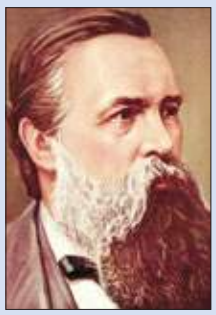

মার্কসের সময় থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি বলে পরিচিত, তা সামন্তী ব্যবস্থার সাথে অর্থাৎ সামন্তী ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তিবিশেষ, একটা সমগ্র সামাজিক সম্প্রদায় ও স্থানীয় সংস্থা যেসব বিশেষ সুবিধা পেয়ে এসেছে, তার সাথে এবং বংশগত সম্পর্কের অধীনস্ত যে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো, তার সাথে (সেই পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি) খাপ খাচ্ছিল না। বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙেছে এবং তার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে তুলেছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা–যে সমাজব্যবস্থা হচ্ছে অবাধ প্রতিযোগিতার রাজত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আইনের চোখে সমানাধিকারের রাজত্ব, সমস্ত পণ্যমালিক ও পুঁজিবাদের আশীর্বাদপুষ্ট বাকি সকলের রাজত্ব। এরপর থেকেই পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারল। বাষ্প, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্র তৈরির যন্ত্র যখন থেকে পুরনো ধরনের কারখানাকে আধুনিক শিল্পে রূপান্তরিত করে দিল, তখন থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীর পরিচালনায় উৎপাদন শক্তি এমন দ্রুততায় ও এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যার কথা আগে কেউ কখনো শোনেনি।

● ২ এর পাতায় দেখুন

জনজীবন	উন্নয়ন
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের হাউজিং প্রকল্পে একটি বালিশের দাম ৫৯৫৭ টাকা, বিছানার চাদরের দাম ৫৯৮৬ টাকা।	পাট শ্রমিকের বেতন মাসে ৪২০০ টাকা। সেটা পেতেও রোজার সময় রাস্তায় আন্দোলনে বসতে হয়। মজুরি কমিশনের বাস্তবায়ন নেই।
বন্যায় আক্রান্ত ২৮ জেলার ৭৬ লাখ লোক। ৩১ জুলাই পর্যন্ত ১১৪ জনের মৃত্যু। প্রায় আড়াই হাজার স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত। তিন লক্ষের উপর মানুষ ঘরবাড়িছাড়া। প্রায় পৌনে ২ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত। সরকার ত্রাণ হিসেবে এ পর্যন্ত সাড়ে ২৪ লাখ টন চাল, ৬০ হাজার বান্ডিল ঢেউটিন ও মাত্র পাঁচ কোটি টাকা অর্থসাহায্য দিয়েছে।	২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয়ের বাজেট ছিল ১৪৫৬ কোটি টাকা। কিন্তু খরচ হয়েছে ৪৭৯৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ সোয়া তিন হাজার কোটি টাকা বাড়তি খরচ হয়েছে এবং সেটা বিনা বাক্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
প্রতি মিনিটে সারাদেশে ৭০ জনেরও বেশি ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। হাসপাতালে আলাদা ওয়ার্ড নেই। সবগুলো জেলায় ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়লেও সকল জায়গায় সনাক্তকরণ কিটের ব্যবস্থা নেই। সতর্কতা ঘোষণা করার পরও ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন ৫০ কোটি টাকা খরচ করে পুরনো, অকার্যকর ওষুধ ছিটিয়েছেন, এখন তারা চীন ও ভারত থেকে নতুন ওষুধ আনার কথা ভাবছেন।	২০১৭ থেকে ২০১৮ এই এক বছরের ব্যবধানে সুইস ব্যাঙ্কে বাংলাদেশীদের আমানত বেড়েছে ১৩শ কোটি টাকা। মশা মারার ওষুধ কিনতে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সময় লাগলেও ইপিজেড-এ বিনিয়োগ করতে কাজের অনুমতিপত্রের জন্য ২১ দিন, গ্যাস সংযোগে ৭ দিন, বিদ্যুৎ সংযোগে ১৪ দিনের বেশি সময় না নেয়ার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন সরকার।
দেশে প্রতি ছয়জনের একজন অপুষ্টির শিকার।	অতি ধনী বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম।
দুই কোটিরও বেশি মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না।	গত দশ বছরে কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে সাড়ে ৫৬ হাজার, বছরে ৬ হাজার ৯৫ জন করে।

ফ্যাসিবাদ ও সংস্কৃতি

শিবদাস ঘোষ

ফ্যাসিবাদ হ'ল অধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এতে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে একই সঙ্গে থাকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক

শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার স্বার্থে বিজ্ঞানের কারিগরি দিককে গ্রহণ করার কর্মসূচি এবং সমস্ত রকম অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় উন্মাদনা ও ভাববাদী ভোজবাজিকে(idealistic jugglery) শোষণমূলক পুজিবাদী ব্যবস্থা এবং বর্তমান সমাজের আনুষঙ্গিক কুফলগুলি থেকে পরিত্রাণের সর্বরোগহর ঔষধ হিসাবে পরিবেশন করার চেষ্টা। এইভাবে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি হ'ল বৈজ্ঞানিক বা সত্যনিষ্ঠ চিন্তার সাথে অলীক চিন্তার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। এতে প্রকৃতি জগতের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অন্যদিকে সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণায় অলীক চিন্তাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়াকে কার্য-কারণ সম্পর্ক যাচাই-এর বৈজ্ঞানিক পথ থেকে অন্ধবিশ্বাস, পূর্বধারণা ও কুসংস্কারের চোরাপথে চালিত করা এবং তার দ্বারা শেষপর্যন্ত সামাজিক ক্রিয়া সম্পর্কে অবজ্ঞা সৃষ্টি করা। অবৈজ্ঞানিক, অলীক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফ্যাসিবাদ সমাজবিজ্ঞানের শ্রেণীসংগ্রামের

● ৭ এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়ার চিকিৎসা নিয়ে ব্যবসা করার প্রতিবাদে ঢাকা নগর ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত

- অবিলম্বে ঢাকা নগরকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা কর।
- সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য বিনামূল্যে পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।
- বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা বাণিজ্য বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নাও।
- অকার্যকর মশা নিরোধক ওষুধ বাতিল করে নতুন ওষুধ ক্রয় কর।
- প্রতিটি উপজেলা হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত করার ব্যবস্থা কর।

দশ বছরে সাতবার বাড়লো গ্যাসের দাম

প্রতিবাদে বামজোটের হরতাল, জ্বালানী মন্ত্রণালয় ঘেরাও

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, সিলিন্ডার গ্যাসের দাম কমানোর দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের আহবানে গত ৭ জুলাই দেশব্যাপী পালিত হলো অর্ধদিবস হরতাল। জনগণের দাবি নিয়ে এই হরতার, তাই হরতালের প্রতি জনগরণর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল। হরতালের আগের দিন চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ হরতালের প্রচার মিছিলে হামলা চালায়, দলীয় অফিসে অবৈধভাবে তল্লাশী চালায়। হরতালের দিনও ঢাকা, জয়পুরহাট, নওগাঁ, মানিকগঞ্জে পুলিশ বাঁধা দেয়।

পুরো দেশবাসী গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিকে অন্যায় ও অযৌক্তিক মনে করার পরও সরকারের কর্তাব্যক্তিরা একে 'যৌক্তিক' বলে সমানে বক্তব্য রাখছেন। হরতালের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী উষ্মাও প্রকাশ করেছেন। বলেছেন,"অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাইলে আন্দোলন না করে গ্যাসের দামবৃদ্ধির বিষয়টি মেনে নিতেই হবে।" অর্থাৎ উন্নয়ন চাইলে দাম

- বিশ্ববাজারে কমেছে ৫০ শতাংশ
- আমাদের বেড়েছে গড়ে ৩৩ শতাংশ

দিতে হবে। এটা উন্নয়নের দাম–'ডেভেলপমেন্ট কস্ট'। ফলে সরকারি ভুল পদক্ষেপের নিন্দা করলে আপনি উন্নয়নবিরোধী হবেন। সরকারের গণবিরোধী কোন পদক্ষেপের বিরোধিতা করলেই আপনি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, দেশদ্রোহী হয়ে পড়বেন মূহুর্তেই। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কে না চায়? প্রশ্ন হচ্ছে উন্নয়নটা কার হচ্ছে? কৃষক ফসলের উৎপাদন মূল্যও পাচ্ছেনা, শ্রমিক ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেনা।

● ২ এর পাতায় দেখুন

সাম্যবাদ

সমাজতন্ত্র : কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক

কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশের সময় যেমন তার প্রভাবে পুরনো ধরনের উৎপাদন ও হস্তশিল্প আরো বিকশিত হয়ে গিল্ডের সামন্তী শৃঙ্খলের সাথে সংঘাতে এসেছিল, ঠিক তেমনি আজকের আধুনিক শিল্পও তার আরো পরিপূর্ণ বিকাশের পর্যায়ে, সংঘাতে আসছে সেইসব সীমার সঙ্গে, যে সীমার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে। নয়া উৎপাদিকা শক্তি ইতিমধ্যেই উৎপাদনশক্তিকে ব্যবহার করার পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এবং উৎপাদিকা শক্তির সাথে উৎপাদনপদ্ধতির এই যে বিরোধ তা মানুষের মনের কল্পনায় সৃষ্ট আদিম পাপ ও স্বর্গীয় ন্যায়ের মধ্যে বিরোধের মত কোনও বিরোধ নয়। আমাদের জানার বাইরে, এমনকী যারা এই সংঘাত সৃষ্টি করেছে, সেইসব মানুষদের অভিপ্রায় ও কর্ম নিরপেক্ষভাবেই, বাস্তব সত্য ঘটনা হিসাবে এই সংঘাত অবস্থান করছে। আধুনিক সমাজতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে চিন্তার ক্ষেত্রে এই বাস্তব সংঘাতেরই প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়; যে শ্রেণি এই সংঘাতে পীড়িত হচ্ছে, সর্বাগ্রে সেই শ্রমিকশ্রেণীর মননজগতে এই সংঘাতের আদর্শ প্রতিফলন হচ্ছে সমাজতন্ত্র।

[সংগৃহীত–*সমাজতন্ত্র: কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক*, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, বাংলা মুদ্রণ, ২৫ জুলাই ২০১৬, গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩]

দশ বছরে সাতবার বাড়লো

একদিকে দেশে অতি ধনী হু হু করে বাড়ছে, অন্যদিকে গরীব সাধারণ মানুষের আয় কমছে। বেকারত্ব বাড়ছে। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে শিল্প, কৃষি, সার, যানবাহন সবকিছুর দাম বাড়ে। ফলে বাজারে সবকিছুর দাম বেড়েছে, বাসাভাড়া, গাড়িভাড়া, খাবার খরচ সবই বেড়েছে।

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির পক্ষে সরকারের প্রধান যুক্তি হলো, দেশে চাহিদার তুলনায় গ্যাস উৎপাদন কম, গ্যাসের সংকট। তাই বিদেশ থেকে বেশি দামে তরলীকৃত গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করে তা কম দামে দেয়ায় বিপুল পরিমাণ আর্থিক ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এটি সমন্বয় করার জন্যই দাম বাড়াতে হচ্ছে। একথাটাও ঠিক নয়। পাশের দেশ ভারত যেখানে সৌদি আরব থেকে ৬ ডলারে এলএনজি কিনছে, সেখানে বাংলাদেশ ১০ ডলারে কাতার, ওমান থেকে কিনছে। কেন? –তার উত্তর হয়তো সবাই জানেন। এখানে দেশের লোককে দু'বার জবাই করা হয়। বেশিদামে কিনে লোকসান পোষাবার জন্য গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়, আবার বেশি ক্রয়মূল্য পরিশোধ করে সরকারি কোষাগার খালি করা হয়– যার চাপ জনগণের উপরই পড়ে। বর্ধিত মূল্যের একটা অংশ লুটপাট হয়।তাই 'বর্ধিত মূল্যে আমরা গ্যাস কিনলাম কেন?'– হাইকোর্টের এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর সরকার এ পর্যন্ত দিতে পারেনি।

সত্যিই কি দেশে গ্যাস সংকট, এলএনজি আমদানী জরুরী?

একসময় বলা হলো, 'দেশ গ্যাসের উপর ভাসছে'– ফলে গ্যাস রপ্তানি করো। আর আজ বলা হচ্ছে 'দেশে গ্যাসের সংকট, তাই গ্যাস আমদানি করতে হবে।' সত্য ঘটনাটা কী? বাংলাদেশের স্থলভাগ ও সমুদ্রবক্ষে যে তেল ও গ্যাসের মজুত আছে এবং ভবিষ্যতে নতুন তেল-গ্যাস মজুদ পাওয়ার যে সম্ভাবনা আছে, সরকার যদি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে এবং পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করে, তা হলে গ্যাসের সংকট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ১৯৯৯ সালের পর গত ২০ বছরে নতুন কোন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কার করা হয়নি। সরকার গত ১০ বছরে এলএনজি নিয়ে নানা পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, কিন্তু কোন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান বা গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ নেয়নি। সামর্থ্য ছিলনা কি? ভারত, মায়ানমারের থেকে সমুদ্রজয় নিয়ে বিরাট মাতামাতি হলো, এমনকি শেখ হাসিনাকে সমুদ্রমাতা উপাধিতে ভূষিত করা হলো, কিন্তু সাগরের যে বিপুল গ্যাস, তা উত্তোলন করে গ্যাস সংকট নিরসনে উদ্যোগ নেওয়া হলোনা। অথচ পাশাপাশি গ্যাসক্ষেত্র থেকে ইতিমধ্যে ভারত, মিয়ানমার গ্যাস উত্তোলন করছে। এভাবে গ্যাস সংকট অনিবার্য করে উচ্চমূল্যের এলএনজির দাম ভোক্তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হলো। স্থলভাগে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের সম্পূর্ণ সক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা থাকলেও, তাকে বসিয়ে রেখে বিদেশী প্রতিষ্ঠান রাশিয়ার 'গ্যাজপ্রম', আজারবাইজানের 'সোকার'কে দিয়ে গ্যাসকূপ খননের কাজ করছে। একটি কূপ খননে যেখানে বাপেক্সের খরচ হয় ৬০-৮০ কোটি টাকা, সেখানে বিদেশি কোম্পানিকে দিতে হচ্ছে ২৫০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, সারা দেশের স্থলভাগে ১১০টি কূপ খনন করা হবে। এসব কূপ যদি 'গ্যাজপ্রম' ও অন্যান্য বিদেশী কোম্পানি দিয়ে করা হয়, তাহলে সরকারের বার্ষিক ক্ষতি হবে ১০ হাজার কোটি টাকার মতো। কম দামে গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হবে এভাবেই। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বদরুল ইমাম বলেন, "প্রতিবছর বাংলাদেশে যে পরিমাণ এলএনজি আমদানি করা হবে, তাতে খরচ হবে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২৫ হাজার কোটি টাকার মতো। এ খরচটা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক চাপ তৈরি করবে।" এ বিরাট ঘাটতি মেটাতে কিছুদিন পর পরই গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়বে। ফলে জনগণের জন্য ভবিষ্যতে আরো দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে।

গ্যাস নিয়ে বিরাট মুনাফার ব্যবসা

আবাসিকে ও শিল্পে নতুন গ্যাস সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হলো গ্যাস সংকটের কথা বলে। গ্যাসের চাপ কমিয়ে দেয়া হলো। উদ্দেশ্য– এতে মানুষ বেশি দামে এলপিজি কিনতে বাধ্য হবে। ভবিষ্যতে ৪০ লাখ টন এলপিজির নিশ্চিত বাজার সম্ভাবনায় দেশের সমস্ত বড় ব্যবসায়ীরাই এলএনজি ব্যবসায় নেমে পড়লেন। ইতোমধ্যে ৫০-৬০টি কোম্পানিকে সরকার এলএনজি সিলিন্ডার বাজারজাতকরণের অনুমতি দিয়েছে। বসুন্ধরা, যমুনা, সামিট এই বিরাট বিরাট শিল্পগোষ্ঠীসহ ১৫-১৬টি কোম্পানি ইতোমধ্যেই বাজারে নেমেছে। সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খানের সামিট গ্রুপ বেসরকারী বিদ্যুতকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৬০-৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। তাদেরকে দেশের প্রথম এলএনজি প্ল্যান্ট স্থাপনের কন্ট্রাক্ট দেয়া হয়েছে। সরকারের বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ঠ এস আলম গ্রুপও প্ল্যান্ট করার অনুমতি পেয়েছে। দেশের সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে সমিতিও গঠন করেছে, যার সভাপতি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা কুখ্যাত ঋণখেলাপী সালমান এফ রহমান। তাঁরা ইতোমধ্যে দাবি তুলেছিল– তাদের সিলিন্ডার গ্যাসের তুলনায় লাইনের গ্যাসের দাম কম, ফলে লাইনের গ্যাসের দাম বাড়াতে হবে, না হলে এক দেশে তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, লোকসান হচ্ছে। সরকারের জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদও বললেন, "বৈষম্য চলতে পারেনা, দাম সমন্বয় করা হবে।" অর্থাৎ লাইনের গ্যাসের দাম বাড়িয়ে এলএনজি গ্যাসের সমান করা হবে। তারা বৈষম্য শুধু জনগণের ব্যবহার করা গ্যাস, বিদ্যুতেই খোঁজেন! মন্ত্রীরা বেতন ও আনুষঙ্গিক ভাতা মিলে মাসে কয়েক লাখ টাকা পান, অথচ গার্মেন্টস্ শ্রমিক যে মাসে ৮০০০ টাকা পান, সে বৈষম্য সম্পর্কে তারা নির্বিকার। সমাজে ধনীর আয় বাড়ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের আয় কমছে, সে বৈষম্যও তাদের চোখে পড়েনা।

১২ কেজি একটি সিলিন্ডারের দাম ৪৫০ টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়, অথচ দেশি বিদেশী বেসরকারি কোম্পানির সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে ৯০০-১১০০ টাকায়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম বাংলাদেশি টাকায় পড়ে ৪৮৩ টাকা। আইন অনুযায়ী, সিলিন্ডার গ্যাসের দাম নির্ধারণ করার কথা বিইআরসি'র। কিন্তু এক্ষেত্রে সিলিন্ডার ব্যবসায়ীরাই তাদের মতো করে দাম নির্ধারণ করে, সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ এখানে নেই। রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বিপিসি'র (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন) সহযোগী প্রতিষ্ঠান এলপি গ্যাস লিমিটেডের সাড়ে ১২ কেজি ওজনের প্রতি সিলিন্ডার এলপি গ্যাসের মূল্য ৭০০ টাকা, কিন্তু বাজারে তার দেখা পাওয়া যায়না। দেশে বাৎসরিক এলপি গ্যাসের চাহিদা রয়েছে ১০ লাখ মেট্রিকটন, কিন্তু বিপিসি সরবরাহ করে মাত্র ১৬ হাজার মেট্রিকটন। ২০০৯ সাল থেকেই সরকার বলে আসছে, বিপিসি'র মাধ্যমে এলপিজি'র সরবরাহ বাড়িয়ে গ্রাহক ভোগান্তি দূর করা হবে। অথচ তা করা হয়নি। যেখানে সরবরাহ বাড়িয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে বিপিসির ভূমিকা রাখার কথা ছিল, তার বিপরীতে বাজার তুলে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের হাতে।

তাহলে আমরা দেখছি, সরকারের ভুল জ্বালানি নীতি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে বসিয়ে রেখে গ্যাসক্ষেত্র বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া, স্থল ও সাগরের গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের উদ্যোগ না নেয়া– এসবের মাধ্যমে গ্যাসের কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়েছে। একইসাথে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করে মানুষকে এলপিজি ব্যবহারে বাধ্য করা হচ্ছে। স্পষ্টতই মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী ও দেশিবিদেশি সিলিন্ডার ব্যবসায়ীদের স্বার্থেই গ্যাসের এ মূল্যবৃদ্ধি।

আবারও নামতে হবে রাস্তায়

পাটশিল্প ও পাটখাত?

পাটশিল্প বিপুল সম্ভাবনাময়

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ার ফলে পচনশীল ও নবায়নযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ছে। ফলে বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে বিপুলভাবে। চলতি বছর ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারে নিরুৎসাহিতকরণে আইন পাস করেছে। তারা এর বর্তমান ব্যবহারের ৮০ শতাংশ কমিয়ে দিতে চায়। আগামী ২০২০ সাল থেকে সারা ইউরোপে একযোগে প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী এ রকম পরিস্থিতিতে 'রিসার্চ অ্যান্ড মার্কেট'র এক গবেষণায় বলা হচ্ছে, ২০২২ সাল নাগাদ শুধু পাটের ব্যাগের বৈশ্বিক বাজার দাঁড়াবে ২৬০ কোটি ডলারের। বিশ্বে বর্তমানে ফুডগ্রেড পাটের ব্যাগের চাহিদা যেখানে ৩২ মিলিয়ন এবং পাটের শপিংব্যাগের বৈশ্বিক বার্ষিক চাহিদা ৫০০ বিলিয়ন সেখানে প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ ও ভারত মিলে সরবরাহ করতে পারে মাত্র ফুডগ্রেড পাটের ব্যাগ ১২ মিলিয়ন আর শপিংব্যাগ মাত্র ৪০ মিলিয়ন। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জুট জিও টেক্সটাইলের (পাট থেকে তৈরি একধরণের টেক্সটাইল– যা রাস্তা, বাঁধ, বন্দর, পাইপলাইন সহ নানা নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়) চাহিদা ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধির আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিজ্ঞানী অধ্যাপক মোবারক আহমদ খান পাটের আঁশ থেকে পলিমার ব্যাগ তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। ২০০৯ সালে এই বিজ্ঞানী পাটের সঙ্গে পলিমারের মিশ্রণ ঘটিয়ে মজবুত, তাপ বিকিরণরোধী ও সাশ্রয়ী ঢেউটিন 'জুটিন' বানান। একই প্রযুক্তি ও কাঁচামাল ব্যবহার করে তিনি হালকা অথচ মজবুত হেলমেট, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের রিং, চেয়ার, টেবিল, টাইলসসহ বেশ কয়েকটি নিত্যব্যবহার্য পণ্য তৈরি করেছেন। পাটের তৈরি পলিমারের ব্যাগ সাধারণ পলিব্যাগের চেয়ে দেড় গুণ টেকসই ও মজবুত। মাটি চাপা পড়লে পাট পলিব্যাগ চার থেকে পাঁচ মাস পর পচে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে শুরু করে। পানিনিরোধক এই পলিব্যাগ দামেও খুব একটা বেশি নয়। শহরকে পলিথিন মুক্ত ঘোষণা করতে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন সিটি কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ এই পলিব্যাগ কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এরই মধ্যে ২৩৫ ধরনের দৃষ্টিনন্দন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করছে। 'ন্যাচারাল ফাইবার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড' নামে একটি সংস্থার ফেব্রুয়ারি মাসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ বছরের শুরুতে বিশ্ববাজারে প্রতি টন পাটের দাম ১০ থেকে ২৫ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বেড়েছে। বিলাসবহুল মোটরগাড়ি নির্মাণ করে এমন পাঁচটি বড় কোম্পানি ঘোষণা দিয়েছে, তারা তাদের গাড়ির অভ্যন্তরীণ কাঠামোর একটা বড় অংশ তৈরি করবে পাটজাত পণ্য দিয়ে। পাট থেকে ভিসকস উন্নতমানের মিহি সুতা, জুটন (পাট ও তুলার সংমিশ্রনে তৈরি কাপড়) উদ্ভাবন পাটের সম্ভাবনা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু পাটের আঁশ নয়, পাটকাঠি বা পাটের সোলাও আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন পণ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পাটকাঠি থেকে জ্বালানি হিসেবে চারকোল ও এর গুঁড়া থেকে ফটোকপিয়ার মেশিনের কালি তৈরি হচ্ছে। পাট থেকে মণ্ড ও কাগজ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া উপযোগী মাটি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকায় বাংলাদেশে পৃথিবীর সেরা জাতের পাট উৎপাদন হয়। আমাদের আছে গত ৫০-৬০ বছরে গড়ে উঠা অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তি। পাট একসঙ্গে কৃষি ও শিল্পের সাথে যুক্ত থাকায় এ দুই খাতের বিকাশই এর উপর নির্ভরশীল। পাটকে কেন্দ্র করে কৃষি ও শিল্পখাতে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। শুধু প্রয়োজন পাট শিল্প বিকাশে সরকারের সঠিক নীতি, পরিকল্পনা ও তার যথাযথ প্রয়োগ। সম্ভাবনা আছে বলেই বেসরকারী পাটকলগুলো লাভ করছে। এখন প্রশ্ন, এত বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পাট খাত ধুঁকছে কেন? আমাদের দেশের অর্থনীতকে তো আমাদের দেশের উৎপাদন ও দক্ষতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। উপরের আলোচনা থেকেও বোঝা যায় যে, এক্ষেত্রে সম্ভাবনা প্রচুর। তাহলে আসলেই কি লোকসান হচ্ছে নাকি কৃত্রিমভাবে লোকসান দেখানো হচ্ছে?

পাটশিল্পের লোকসান সমাচার

বর্তমানে বাংলাদেশে ২৬টি রাষ্ট্রায়াত্ত্ব পাটকল ও ৭৬টি বেসরকারি পাটকল রয়েছে। পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি) আওতাধীন ২৬টি পাটকলের মধ্যে বর্তমানে চালু আছে ২৫টি। এর মধ্যে ২২টি পাটকল ও ৩টি নন-জুট কারখানা। 'মিলস ফার্নিশিংস লিমিটেড' নামের নন-জুট কারখানা ছাড়া বাকি ২৪টি প্রতিষ্ঠানই লোকসানে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিজেএমসির পাটকলগুলোর (জুট ও নন-জুট) লোকসানের পরিমাণ ছিল ৪৮১ কোটি টাকা। পাটকলে লোকসানের বড় কারণ, যথাসময়ে পাট ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ না দেওয়া। জুলাই মাসে পাট কেনার মৌসুম হলেও অর্থ বরাদ্দে দেরীর অজুহাতে সরকারী কর্মকর্তারা সে পাট কেনেন অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে। ফলে ১০০০ থেকে ১২০০ টাকায় যে পাট কেনা যায়; তা কিনতে হয় ২৪০০ থেকে ২৫০০ টাকায়। ফলে লোকসানের বোঝা বাড়তেই থাকে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রায়াত্ত্ব কারখানাগুলোর কোনো আধুনিকায়ন হয়নি। চট্টগ্রামের আমিন জুট মিল স্থাপিত হয় ১৯৫৪ সালে, গত ৬৫ বছর ধরে সেই পুরনো যন্ত্রপাতিই চলছে। সবগুলো কারখানায় বেশিরভাগ তাঁতই বিকল ও পুরাতন হয়ে পড়ায় উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ সালে বিজেএমসি'র পাট ক্রয়ের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১৭.৯০ লক্ষ কুইন্টাল। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পাট ক্রয় করা হয় ১.৫৮ লক্ষ কুইন্টাল যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৮.৮৩%। অপরদিকে ১১,০২৩ টি তাঁতের বিপরীতে সচল আছে মাত্র ৫৫৪৮টি।

ফলে ৮.৮৩% কাঁচামাল আর ৫০% সচল তাঁত দিয়ে অদক্ষ আমলা প্রশাসনের ভ্রান্ত নীতির বিপরীতে আমাদের পাটকল শ্রমিকরা তাঁদের দক্ষতায় সরকারি পাটকলসমূহকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অথচ সরকারী আমলারা লোকসানের দায়ভার শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেন। বিজেএমসির চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সম্প্রতি প্রথম আলোকে বলেন,"স্থায়ী শ্রমিকদের উচ্চ মজুরি পাটকলগুলোর লোকসানের প্রধান কারণ। প্রয়োজনের চেয়ে শ্রমিক বেশি। এ জন্য উৎপাদন খরচ বাড়ে।" এর সাথে আমলারা শ্রমিক অসন্তোষকেও লোকসানের কারণ হিসেবে দেখান। অথচ পাট মন্ত্রণালয়েরই এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এক বছরের লোকসান ৪২১ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৩০ কোটি টাকা শ্রমিক আন্দোলন থেকে সৃষ্টি। আর প্রয়োজনের চেয়ে শ্রমিক বেশি নয়, বাস্তবে কারখানার উৎপাদনক্ষমতার অর্ধেকও ব্যবহার করা হয় না।

পাটশিল্পকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার জন্যই এই কৃত্রিম লোকসান

সম্প্রতি পাটমন্ত্রী মির্জা আজম যমুনা টিভির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, পাটকলগুলোর লোকসান কাটাতে জনগণের টাকা থেকে এভাবে বছর বছর ভর্তুকি দেয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রায়াত্ত্ব পাটকলগুলোকে পিপিপির (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ) অধীনে ছেড়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ সোজা কথায় বেসরকারীকরণ করা হবে। সরকার কি চায় তা পাট মন্ত্রীর বক্তব্যেই স্পষ্ট। স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি সরকারের আমলেই ভ্রান্ত নীতি, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না দেওয়া, মাথাভারী প্রশাসন বৃদ্ধি, মুষ্টিমেয় কর্মকর্তার দুর্নীতি-লুটপাটের কারণে পাটখাতে সংকট, লোকসান বাড়তে থাকে। এ লোকসান কমানোর জন্য বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে ২০০০ কোটি টাকা ঋণ দেয় এবং ঋণের শর্ত হিসেবে পাট খাত সংকোচন বা ডাউনসাইজিং করা শুরু হয়। এর ফলে লোকসান আরো বাড়তে থাকে। মাত্র ১২০০ কোটি টাকা লোকসানকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আদমজীকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৭-০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একের পর এক পাটকল বন্ধ করা হয়। দিনমজুরির ভিত্তিতে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করে বেসরকারী পাটকল চালু হলেও পাটশিল্পের সংকোচননীতি চলতে থাকে। পাট শিল্পকে লাভজনক করার অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০৯ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসে। বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ৫টি পাটকল চালু করে সরকার বাহবা নিলেও, পাটকলকে লাভজনক করতে কোন পদক্ষেপই তারা নেয়নি। সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে 'পাট দিবস' পালন করছে, প্রধানমন্ত্রী 'পাটের সোনালী দিন ফিরিয়ে আনা'র ঘোষণা দিচ্ছেন অথচ একই সময়ে পাট শ্রমিকদের মাসের পর মাস মজুরি বকেয়া থাকছে। পাটমন্ত্রী বার বার অভিযোগ করছেন– অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিচ্ছেনা। সরকার যদি সত্যিকার অর্থেই আন্তরিক হয়, অর্থমন্ত্রী কেন টাকা দেবেন না ? এ কি বাস্তব না বিশ্বাসযোগ্য ?

আমরা দেখছি, দুই মন্ত্রণালয়ের ঠোকাঠুকির নাটক যখন চলছে তখন মঞ্চের পাশেই অতীতের পাটশিল্প বিরোধী নীতির বাস্তবায়ন তো দ্রুতগতিতে চলছে। বাস্তবে সরকার এক ঢিলে দুই পাখি মারার নীতি নিয়েছে। রাষ্ট্রায়াত্ত্ব পাটকলগুলোকে লোকসানি প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে সেখানে ধীরে ধীরে ব্যক্তিমালিকানাকে উৎসাহিত করা হবে। ইতিমধ্যে পাটখাতকে 'পিপিপি'র আওতায় আনার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এতে ইতিমধ্যে গড়ে উঠা রাষ্ট্রায়াত্ত্ব পাটকলের অবকাঠামো ব্যবহার করা যাবে আবার গোটা পাটের বাজারটাই ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাবে। চীনের একটি প্রতিষ্ঠান দেখাচ্ছে মাত্র ২৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিলেই রাষ্ট্রায়াত্ত্ব পাটকলের অধুনিকায়ন সম্ভব। কিন্তু সরকার সে বরাদ্দ করছে না। যে দেশের অর্থমন্ত্রী বেসিক ব্যাংকের অর্থলুটের ঘটনায় বলতে পারেন ৪৫০০ কোটি টাকা কোন ব্যাপার নয়, সে দেশের সরকার এ টাকা বরাদ্দ দিতে পারবেনা, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ এ মিলগুলোকে আধুনিকায়নের জন্য সরকার ২০১৬ সালে চীনের রাষ্ট্রায়াত্ত্ব প্রতিষ্ঠান 'সিটেক্স আইসি'র সাথে সমঝোতা চুক্তি করেছে। চীন সরকার এ অর্থ ২০ বছর মেয়াদী ১.৫ শতাংশ সুদে ঋণ দেবে। এ ঋণের শর্তে আছে, মিলগুলো আধুনিকায়নের পর উৎপাদিত পণ্য চীনকে বিপণন ও রপ্তানির অধিকার দিতে হবে। (বণিক বার্তা-২৭ জুলাই,২০১৯)। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে যখন মিলগুলোর আধুনিকায়ন সম্ভব, সেখানে এধরণের কঠিন শর্তে কেন চীনের সাথে চুক্তি করা হলো,তার কোন উত্তর আছে কি? কিন্তু যেকোন রাজনীতি সচেতন মানুষই বুঝতে পারেন এর প্রকৃত কারণ কি?

পাটখাতে পিপিপির প্রস্তাবনা বেসরকারীকরণেরই চক্রান্ত, এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, পাটখাতের লোকসান কৃত্রিম।

গত চার দশক ধরে চলে আসা পাট শিল্পবিরোধী নীতি ছেড়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষাকারী পাটনীতি প্রনয়ণ ও অনুসরণ, অব্যবস্থাপনা ও দূর্নীতি-লুটপাট বন্ধ, পাটখাতকে লাভজনক করা সম্ভব। সে পথে না হেঁটে এখন লোকসানের সমাধান হিসেবে ১৪ টি পাটকলকে পিপিপি'র (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ) আওতায় ছেড়ে দেওয়া হবে বলে পাটমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ মিল, যন্ত্রপাতি থাকবে রাষ্ট্রের আর তাতে ব্যবসা করবে ব্যবসায়ীরা। যাকে এক কথায় বলা যায়, পাবলিকের পকেটের টাকায় প্রাইভেট কোম্পানির মালিকদের মুনাফা। ফলে পাটখাতকে লাভজনক করা এবং পাটখাতকে পিপিপির নামে বেসরকারীকরণের চক্রান্ত বন্ধ করার দাবি সমস্বরে তোলা দরকার। রাষ্ট্রায়াত্ত্ব পাটকল শ্রমিকদের ৯ দফা দাবিতে আন্দোলনকে আমরা বেগবান করার আহবান জানাই। পাশাপাশি আমরা পাটকল শ্রমিকদের আহবান জানাই, আন্দোলনকে শুধুমাত্র মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন বা পেশাগত দাবিতে গন্ডীবদ্ধ না রেখে পাটখাতকে লাভজনক করা এবং পাটখাতকে পিপিপির নামে বেসরকারীকরণের চক্রান্ত বন্ধ করার দাবিতে আন্দোলন জোরদার করুন। তাহলেই এ শিল্প তথা আপনাদের জীবন-জীবিকা রক্ষা পাবে।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী

জীবন ও সংগ্রামের কিছু দিক

শোষিত-নিপীড়িত মানুষের নেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সে-জন্যেই তাঁর নামের সঙ্গে কে বা কারা কবে কখন জুড়ে দিয়েছিলো একটি অভিধা : 'মজলুম জননেতা'। যথার্থ ছিলো এই অভিধা। ... তিনি একজন ধর্মীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও সংস্কারমুক্ত মনেই নিজেকে নিবেদন করেন নিপীড়িত বঞ্চিত পদানত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, সে-জন্যে কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নেন রাজনীতিকেই। ... একালে প্রথাগতভাবে রাজনীতি করা হয় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া অথবা ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে, কিন্তু ভাসানীর রাজনীতি ছিলো শাসনক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। যদিও তাঁর দল একাধিকবার ক্ষমতাসীন হয়েছে। তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি একবাক্যে যা বলেছেন তার তাৎপর্য তাঁর নিজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য: *"রাজনীতি হইতেছে একটি মহৎ কর্মপ্রয়াস যার লক্ষ্য সমাজ হইতে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটাইয়া জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করা: সমাজে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, বাকস্বাধীনতা তথা সামগ্রিক গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা।"*[২]

গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনি সামন্তবাদী সমাজের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে পরিচিত হন জীবনের শুরুতেই। তারপর শৈশবে পিতামাতা আত্মীয়পরিজন হারিয়ে পরিবারের ছায়া, পরিবারের স্নেহমমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি তাঁর অল্প বয়সে ছন্নছাড়া কৃষক, ক্ষেতমজুর, জেলে, তাঁতী, কামার-কুমার প্রভৃতি শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সমস্যা ও তাদের মূল শত্রু জমিদার, মহাজন, আমলা মুৎসুদ্দিদের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে অপার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সে অভিজ্ঞতা হয়তো এ দেশের কোটি কোটি মানুষেরই ছিলো, কিন্তু অনন্যসাধারণ বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী ভাসানী শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং সে-বিদ্রোহ অহিংস নয়। পরিণত বয়সে তাই তাঁর মুখে বারবার শোনা যায়: *"তোমরা হিংসা করো। শোষক ও জালেমকে হিংসা করো। হিংসার আগুনে শোষকের সৌধ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দাও।"* তিনি বলেছেন: *"জমির পরিমাপে মানুষে মানুষে শ্রেণিভেদ করাটা আমি বরদাস্ত করিতে পারিতাম না। জমিদার মহাজনদের সুপরিকল্পিত শোষণের পরিচয় যেদিন পাইয়াছিলাম, সেইদিন মনে মনে চাহিয়াছিলাম, গোটা সমাজব্যবস্থাটাকে দুমড়াইয়া নতুন কিছুর পত্তন করি।"*[৩]

এক অপ্রতিরোধ্য ক্রোধ আজীবন ভাসানীকে তাড়িত করেছে। সে-ক্রোধ অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে। সেই পবিত্র ক্রোধের তাড়নায় তিনি ঝঞ্ঝার মতো নিরন্তর ছুটে বেড়িয়েছেন, যে কোনো ধরনের অন্যায়-অত্যাচারের মুখে তাঁর কোনো অবসর ছিলো না। ব্যক্তিগত অন্যায়, গোষ্ঠীগত অন্যায়, সম্প্রদায়গত অন্যায়, সরকারের অন্যায়-অবিচার, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের অন্যায়-অত্যাচার – এ সবকিছুই তাঁকে সমানভাবে উত্তেজিত করে তুলতো। মৃত্যুর মাত্র চার দিন আগে, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬, সন্তোষে খোদা-ই-খিদমতগার সম্মেলনে তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে তিনি বলেন: *"অন্যায়ের প্রতি অনীহা [হয়তো তিনি বলতে চেয়েছিলেন ঘৃণা] আমাকে সারাজীবন বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার প্রেরণা জুগাইয়াছে। এই স্বভাবজাত প্রবণতার সহিত যোগ হইয়াছে আসামের জলেশ্বরের সুফী সাধক হযরত শাহ নাসিরুদ্দীন বোগদাদির আধ্যাত্মশিক্ষা। আরো যোগ হইয়াছে উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধাপে ধাপে খেলাফত আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ আন্দোলন, কৃষক প্রজা আন্দোলন, পাকিস্তান যুগে ভাষা-আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন হইতে স্বাধিকার, স্বাধিকার হইতে স্বাধীনতা আন্দোলন – এই সবই আমি ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু হইতে অবলোকন করিয়াছি।"*[৪]

তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে মওলানা তাঁর বেদনা ও হতাশার কথা অকপটে স্বীকার করেও শেষ পর্যন্ত আশাবাদই ব্যক্ত করলেন: *"আমার বিগত ৭৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতার হাতবদল কখনো বা অতি নিকট হইতে কখনো বা কিঞ্চিৎ দূর হইতে অবলোকন করিয়াছি। এই পর্যায়ক্রমিক পটপরিবর্তনের ধারায় আমি নিজেও সাধ্যমতো সক্রিয়তা বজায় রাখিয়াছি। কিন্তু যে কৃষক-মজুর, কামার-কুমার, জেলে-তাঁতী ও মেথর প্রভৃতি মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন আমি আবাল্য দেখিয়াছি এবং সে-জন্য সংগ্রাম করিয়াছি, তাহা আজও সুদূর পরাহত রহিয়া গিয়াছে। তাই আমার সংগ্রামের শেষ নাই। এই সংগ্রাম আজীবন চলিবে।"*[৫]

যৌবনে ভাসানী সশস্ত্র বিপ্লবী অর্থাৎ 'সন্ত্রাসবাদীদের' সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা থেকে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবীদের আত্মদান তাদের প্রতি তাঁকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিলো। কিন্তু সেই বিপ্লবীদের – যাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের – সঙ্গে ধর্মীয় কারণে নয়, অন্য কারণে তাঁদের সংস্পর্শে বেশিদিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তাঁদের প্রতি তিনি আমৃত্যু শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের নাম উচ্চারণ করতেন, অপরদিকে আপোসকামী বুর্জোয়া নেতাদের তিনি করতেন সমালোচনা।

এই শতকের দ্বিতীয় দশকটিতে ভাসানীর কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত তথ্য জানার উপায় নেই। এই সময়, প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে, তিনি ময়মনসিংহ-শেরপুর-নেত্রকোনা মহকুমার দুর্গাপুর, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, ধুবাউড়া প্রভৃতি থানায় গারো, হাজং, কোচ প্রভৃতি উপজাতীয়দের জোর করে অথবা প্রলোভন দেখিয়ে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রতিবাদে মিশনারিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের গরিব কৃষকদের সংগঠিত করেন।

মওলানা মোহাম্মদ আলী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে ভাসানী দলীয় রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৯১৯ সালে যোগদান করেন নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসে। চৌদ্দ বছর আগে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও সেটি অতিরিক্ত সরকারঘেঁষা ও সাম্প্রদায়িক বলে তাতে যোগদান না দিয়ে তিনি অপেক্ষাকৃত অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেসে যোগদান করাই সংগত মনে করেন। তিনি ছিলেন চিত্তরঞ্জনের 'স্বরাজ্য দলের'ও একজন সক্রিয় কর্মী। ২০-এর দশকের প্রথম চার-পাঁচ বছর তিনি চিত্তরঞ্জনের একজন অনুগত কর্মী হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তিনি ভারতবর্ষের নানা জায়গা ব্যাপক সফর করেন, সাক্ষাৎ করেন সেকালের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, স্যার আবদুর রহিম, হাকিম আজমল খান, মওলানা হাসরত মোহানী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মওলানা আজাদ সোবহানী, মওলানা মাহমুদ হাসান, হাসান ইমাম, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, এ কে ফজলুল হক, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সুভাষচন্দ্র বসু, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, সৈয়দ হুসেইন আহমদ মাদানী প্রমুখ প্রধান। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণের সঙ্গে যোগ হয় বন্যা প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমাজসেবামূলক কাজ। ১৯২১ সালে তিনি গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং কারাবাস করেন।

আশৈশব সামন্তবাদ ও মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন, মধ্য-২০ থেকে মধ্য-৩০ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ ও আসামে কৃষকদের সংগঠিত করেন, তাদের উত্তেজিত করে তোলেন জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে। এই সময় তিনি বিরাট বিরাট কৃষক-সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং অপরাজেয় কৃষকনেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৩২-এ সিরাজগঞ্জে যে কৃষক-প্রজা সম্মেলন তিনি অনুষ্ঠিত করেন তাতে শুধু জমিদার-মহাজনদের নয়, টনক নড়িয়ে দেন ব্রিটিশ সরকারেরও। সরকার উপলব্ধি করতে পারে বাংলার গ্রামাঞ্চলে এমন একজন নেতার আবির্ভাব হয়েছে যাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রশাসনের পক্ষে কঠিন। চারিত্রে তিনি অন্য বুর্জোয়া নেতাদের মতো নন, বাংলার রাজনীতিতে তিনি যোগ করেছেন এক নতুন মাত্রা। প্রজাসাধারণকে তিনি তুলেছেন ক্ষেপিয়ে যুগপৎ জমিদার-মহাজন ও সরকারের বিরুদ্ধে। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত এক গোপন নথি থেকে জানা যায়, তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে সুপারিশ করে বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারি বড়লাটের কাছে তার পাক্ষিক প্রতিবেদনে জানুয়ারি ১৯৩৩ সালে জানান : 'আবদুল হামিদ খান নামক জনৈক ব্যক্তি এক বিপজ্জনক সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারীরূপে পূর্ববঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছেন'। তিনি তাঁর আগে একবার টাঙ্গাইল মহকুমা থেকে বহিষ্কৃত হন। সিরাজগঞ্জের প্রজা সম্মেলনের পরে ভাসানীর পক্ষে আর বাংলাদেশে থাকা সম্ভবপর ছিলো না। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের মানুষ তাঁকে হয়রানি করতো। তিনি আসাম চলে যান। সূচিত হয় তাঁর জীবনে সংগ্রামের আর এক অধ্যায়ের।

আসাম অধ্যায়

... জমিদার মহাজনদের নির্মম অত্যাচারে, নদীভাঙনে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি নানা কারণে সর্বস্বান্ত কৃষকরা উনিশ শতকের শেষ বছরগুলো থেকেই পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আসামে গিয়ে অনাবাদী জমি চাষ করে বসবাস শুরু করে। তাদের অশেষ পরিশ্রমে আসামে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়ে যায়, অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ আসাম ছিলো ব্রিটিশ ভারতের অনুন্নত এলাকাগুলোর অন্যতম। সেখানে বাংলাভাষীরাই ছিলো অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অগ্রসর। তা ছাড়া বাঙালিরাই ছিলো আসামের অনেকগুলো জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। ... এই সংখ্যাগুরু বাঙালিদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু অসমিয়া জনসাধারণ আন্দোলন শুরু করে। ভাসানী বাঙালিদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।

বিশের দশক থেকেই আদিবাসীদের মধ্যে অভিবাসী বাঙালি কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। অসমিয়াদের চাপের মুখে অভিবাসীদের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এক পর্যায়ে সরকার প্রবর্তন করে কুখ্যাত লাইন-প্রথা। এই লাইন-প্রথা ছিলো একদিকে মানবতাবিরোধী, কারণ আইনগতভাবে ভারতের যে-কোনো এলাকার মানুষ যে-কোনো এলাকায় গিয়ে বসবাস করার অধিকারী ছিলো। লাইন-প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পর আসামের অভিবাসী বাঙালি কৃষকদের, যাদের অধিকাংশই ছিলো মুসলমান, তাদের জীবনে নেমে আসে এক চরম অনিশ্চয়তা: নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে তাদের বসবাসের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। শুধু তাই নয়, এক পর্যায়ে আসাম থেকে তাদের বিতাড়িত করার আন্দোলনও শুরু হয় যা 'বাঙাল-খেদা আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই সব সহায়সম্বলহীন নির্যাতিত নিপীড়িতদের পক্ষে কথা বলার কেউ ছিলো না, আর থাকলেও তাদের কণ্ঠস্বর ছিলো মৃদু ও দুর্বল। ভাসানী তাদের মুখপাত্রে পরিণত হন। প্রবল প্রতিপত্তিশালী ছিলো তাঁর প্রতিপক্ষ: আসামের বুর্জোয়া ও সামন্ত নেতা এবং ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু ভাসানী সর্বৈব অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তার তুলনা এ শতকের পৃথিবীতে বিরল।

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন, ১৯৪৬ পর্যন্ত পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সময় আইনপ্রণয়ন কক্ষের ভেতরে এবং রাজপথে সমান্তরালভাবে তিনি আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। এরমধ্যে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হলে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর চেষ্টায়ই সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, রক্তপাত, ধনসম্পত্তির অপরিমেয় ক্ষতি প্রভৃতি সর্বনাশা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান ও ভারত ১৯৪৭-এ আত্মপ্রকাশ করে। ওই সময় শুধু ভারতবর্ষ নয়, বঙ্গদেশও বিভক্ত হয়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেয় মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন নবাব, জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ী পরিবারের মানুষেরা। হিন্দু জমিদার মহাজন কর্তৃক পূর্ব বাংলার অধিকাংশ শোষিত-নিপীড়িত মুসলমান কৃষকপ্রজার জমিদারবিরোধী মনোভাবকে মুসলিম লীগের বুর্জোয়া নেতারা হিন্দুবিরোধী চেতনায় পরিণত করে। যদিও এই অঞ্চলের দরিদ্র হিন্দু প্রজারা হিন্দু জমিদার কর্তৃক এবং মুসলমান প্রজারা মুসলমান জমিদার কর্তৃক একইভাবে অত্যাচারিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান-আন্দোলন পরিচালিত হলো দ্বিজাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই জানা গেলো মুসলমান শোষক আর হিন্দু শোষকের মধ্যে বিন্দুমাত্র ব্যবধান নেই। ভাসানী শোষকদের 'শুয়োরের' সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন: কালো ও সাদা শুয়োর দুই-ই যেমন হারাম, তেমনি শোষক সাদা হোক, কালো হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক উভয়েই সাধারণ মানুষের শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই ন্যায়সঙ্গত।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভাসানীর ভূমিকা : ৫০-এর দশক

পূর্ব পাকিস্তান কাগজপত্রে ছিলো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অংশ, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের পর দিনই এ দেশের বাঙালি উপলব্ধি করে জাতিগত শোষণ ও অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের এক সুচতুর ষড়যন্ত্র। বলা হলো: পাকিস্তান যেহেতু একটি মুসলিম রাষ্ট্র, সুতরাং এর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। প্রকৃতপক্ষে উর্দুকে মুসলমানদের ভাষা আখ্যায়িত করলেও সেটি ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের প্রিয় ভাষা। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির উপর উর্দু চাপিয়ে দিয়ে তারা বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছিলো। পূর্ব বাংলার ছাত্রযুবসমাজ, বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় ও প্রগতিশীল রাজনীতিকদের একটি অংশ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের গণবিরোধী এই ভূমিকার প্রতিবাদ করে এবং অবিলম্বে তাদের বাঙালিবিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে আন্দোলন শুরু হয়। শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮-৫২র ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেরই বীজ বপন করে। ভাষা আন্দোলনে ভাসানী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন এবং কারারুদ্ধ হন। (*তিনি ছিলেন ১৯৫২ সালে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ'-এর সভাপতি*)

পাকিস্তান অর্জনের কিছুদিন পরে ভাসানী আসামের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে পূর্ববঙ্গে আসেন। এসে টাঙ্গাইলের একটি শূন্য আসনের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীরূপে পূর্ববঙ্গ প্রদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে নির্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তিনি পরিষদে আসনও গ্রহণ করেন, কিন্তু কক্ষে তাঁর উপস্থিতি মুসলিম লীগের গণবিরোধী শাসকদের উদ্বেগ ও অস্বস্তির কারণ ঘটায়। পরিষদের মাত্র একটি অধিবেশনে তিনি যোগ দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন, উচ্চারিত হয় তাঁর কণ্ঠে: "আমরা কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গোলাম?" এই প্রশ্নে শাসকরা সচকিত হয় এবং ভাসানীকে নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। তিনি ছিলেন আসাম প্রদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি, পূর্ববঙ্গে এসে দেখলেন এখানকার লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁকে উপেক্ষা করছেন। প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে তিনি পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি গণমুখী মুসলিম লীগ বা 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেন ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন। ...

১৯৪৯-৫৩ সালের সাড়ে চার বছরের প্রায় অর্ধেক সময়ই ভাসানীকে কারাগারের লোহার গরাদের অভ্যন্তরে অতিবাহিত করতে হয়; কিন্তু জেলের বাইরে যে-সময় তিনি থাকার সুযোগ পান সেই সময়ের তিনি সদ্ব্যবহার করেন বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তর ব্যাপক সফর করে। আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে সফর করে দলকে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যান। অনেকের মধ্যে তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁর দুই তরুণ সহকর্মী দলের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এবং সহ-সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান – তাঁর দুই বলিষ্ঠ বাহু। তিনি হয়ে ওঠেন পূর্ববঙ্গের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিত মজলুম জনগণের কণ্ঠস্বর। ১৯৫৪-র নির্বাচনের আগে তাঁর জনপ্রিয়তার চিত্র পাওয়া যায় সেকালের একটি কবিতার কয়েকটি ছত্রে : *"শহরে বন্দরে গ্রামে ঘরে/হৃদয়-নগরে/মুখের ভাষায় শুনি, বুকের সাড়ায় শুনি, চোখের তারায় দেখি নাম/মৌলানা ভাসানীর নাম।/পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণের কালাম – /কণ্ঠে শুনি তাঁর। হতবাক বিস্ময়ে দেখি/জীবনে জীবনে এ কি/মিলিত প্রাণের গতি, কলকণ্ঠে আকাশ মুখর, /বজ্রে আর ঝড়ে যেন শুনি স্বচ্ছ স্বর/মুখের ভাষায় শুনি নাম।/মৌলানা ভাসানীর নাম।/এই নাম শুনে যেন আশা পাই বুকে/দুঃখ সুখে ... ... তখন হৃদয়ে পাই ভাষা,/দেখি তিনি মানুষের সকলের এমন কি আমাদেরও আশা।/নক্ষত্রসঙ্গের মতো মানুষের জামাতে জামাতে/দেখি তিনি রাখী হাতে।* [আমাদের মিলিত সংগ্রাম: মৌলানা ভাসানীর নাম, আবদুল গাফফার চৌধুরী]

[*১৯৫৪ সালের*] নির্বাচনের আগে এ কে ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি বহুদলীয় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এই যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের পতন ঘটায় শোচনীয়ভাবে। প্রদেশে ফজলুল হকের নেতৃত্বে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের বিজয় মেনে নিতে পারেনি। ষড়যন্ত্র করে নির্বাচিত সরকার বাতিল করে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করে। অনেক নেতা কারারুদ্ধ হন। তার আগেই ভাসানী বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে ইউরোপ গিয়ে আটকে পড়েন। রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায় থেকে তার দেশে ফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়। ১৯৫৪-র আট মাস ইউরোপে এবং '৫৫-র পাঁচ মাস কলকাতায় নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হয় তাঁকে এবং এই সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক ষড়যন্ত্র করে পূর্ববাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অধিকার হরণের আয়োজন সম্পন্ন করে। বাঙালি নেতাদের মধ্যেও ছিলো বিভেদ-বিভ্রান্তি, তাঁদের কাছে দেশের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তির স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেয়। অনেকে আত্মসমর্পণ অথবা সহযোগিতা করেন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কাছে। বারবার পূর্ব পাকিস্তানে সরকার পরিবর্তিত হতে থাকে।

... এর মধ্যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মহাচক্রান্তকারী প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার অধীনে সোহরাওয়ার্দী ... প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২ সেপ্টেম্বর '৫৬ ক্ষমতাসীন হন সোহরাওয়ার্দী। ১১ অক্টোবর '৫৭ পর্যন্ত এগার মাস সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ... প্রধানমন্ত্রী হয়েই সোহরাওয়ার্দী তাঁর দলের নীতি ও পূর্ববাংলার জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষা করেন এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। যে জন্য অবিলম্বে ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কের অবনতি ঘটে। প্রধানমন্ত্রীরূপে ঢাকার পল্টন ময়দানে প্রথম জনসভায় তিনি তাঁর পূর্ববর্তী পাকিস্তান সরকার প্রধানদের মতোই পশ্চিমপন্থী নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ভাসানী তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নভেম্বর '৫৬ সালে সুয়েজখালে ঈঙ্গ-ফরাসি ও ইসরাইলি অবরোধের প্রতিবাদে ভাসানী ঢাকায় এক বিক্ষোভ ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। ভাসানী কর্তৃক দাবি উত্থাপিত হয় পাকিস্তানকে কমনওয়েলথ এবং যুদ্ধজোট সিয়াটো ও বাগদাদ প্যাক্ট থেকে বেরিয়ে আসতে।[৬] পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদঘেঁষা বৈদেশিক নীতির সমালোচনায় ভাসানী ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাঁর নীতির বিরোধিতা আসে তাঁর দলেরই নেতাদের কাছ থেকেই।

ভাসানীকে কেন্দ্র করে দক্ষিণপন্থী পেটিবুর্জোয়াদের থেকে শুরু করে বামপন্থী এমনকি কমিউনিস্টদের সমন্বয়ে একটি বড় মঞ্চ হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগ। ভাসানী হয়ে ওঠেন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রধান মুখপাত্র। মুদ্রা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি ছাড়া সকল বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে তিনি '৪৯ সাল থেকেই অব্যাহত চাপ দিতে থাকেন। ১৯৫৬ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের চারিত্র ছিলো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী। ১৯৫৭ থেকে এই দলের নেতাদের একটি অংশ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তখন দল থেকে পদত্যাগ করে ভাসানী তাঁর বামপন্থী ও প্রগতিশীল সহকর্মীদের নিয়ে গঠন করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, সংক্ষেপে ন্যাপ।

এরপর ৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

সাম্যবাদ

গাজীপুর

রংপুর

শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জেলায় জেলায় কর্মসূচি পালিত

নানা সেক্টরের শ্রমজীবী মানুষ অংশগ্রহণে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা, গাজীপুর, সিলেট, রংপুর ও যশোরে কর্মসূচি পালিত হয়। ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দাবি

১৬ হাজার টাকা ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ঘোষণা কর

অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের দাবি

পুনর্বাসন না করে রিক্সা ও হকার উচ্ছেদ করা চলবে না

বন্ধ সকল কলকারখানা খুলে দাও

ঈদের আগে বেতন বোনাস প্রদান কর।

১২ জুলাই গাজীপুরের জেলা সদরের জয়দেবপুর মুক্তমঞ্চে শ্রমিক সমাবেশে সংগঠনের সভাপতি আ ক ম জহিরুল ইসলাম, শ্রমিক নেতা মাসুদ রেজা, এড ফরিদা ইয়াসমিন নাইস ও মনিরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মশিউর রহমান খোকন।

কমরেড মোজাহেদুল ইসলাম রানু লাল সালাম

গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার ঘাগোয়া ইউনিয়নের পার্টির আহবায়ক, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট সদর উপজেলার সাংগঠনিক সম্পাদক কমরেড মোজাহেদুল ইসলাম রানু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে গত ৫ জুলাই শুক্রবার রাত ৮ টায় ৫১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন কৃষক। পৈত্রিক সামান্য জমিজমা দিয়ে সংসার পরিচালনা করতেন। স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে ছিল তাঁর পরিবার। তাঁর নিজের তেমন লেখাপড়া ছিল না। প্রায় ২৫ বছর আগে কৃষক ফ্রন্ট-এর উদ্যোগে গ্রামীণ জীবনের নানা দাবি নিয়ে ইউনিয়নে ইউনিয়নে গড়ে ওঠা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। দীর্ঘদিন ধরে পরম নিষ্ঠা ও সততার সাথে তিনি দলের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। বাইসাইকেলে চড়ে বিভিন্ন এলাকায় কমরেডদের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং জেলা শহরের সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন। যখন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত তখন বাইসাইকেল ছেড়ে পায়ে হেঁটে এসব যোগাযোগ করেছেন। পারিবারিক কাজ কিংবা সংকট কখনো দলের কাজের ক্ষেত্রে অজুহাত হয়নি। পরিবারকে তিনি দলের সাথে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর বড় ছেলে কৃষক ফ্রন্ট এর ইউনিয়নের সংগঠক, ছোট ছেলে ছাত্র ফ্রন্ট জেলা কমিটির সহ-সভাপতি, স্ত্রী নারী মুক্তি কেন্দ্রের কর্মী। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জনগণের সংকট সমস্যায় তাদের মধ্যে পড়ে থেকে নিজেকে সকলের কাছে পরম আপনজন হিসাবে গড়ে

● ৭ এর পাতায় দেখুন

গৃহকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, সরকারীভাবে ন্যূনতম মজুরী ঘোষণা, কাজে যোগদানের আগে নিয়োগ পত্র দেয়ার দাবীসহ ৯ দফা দাবীতে গৃহকর্মী অধিকার রক্ষা কমিটি, চট্টগ্রাম জেলার পক্ষ থেকে ২মে সকাল ১১ টায় চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে কমিটির সভাপতি আসমা আক্তারের সভাপতিত্বে এবং সহসম্পাদক ওপিয়া আক্তারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশ শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

শিশু কিশোর মেলা' নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে একাদশ শ্রেণীর নবীনবরণ

একদিকে শিক্ষা বাণিজ্যে তীব্রতর হচ্ছে, অন্যদিকে সমাজজুড়ে মানবিক মানুষ হয়ে উঠার আয়োজন ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। এ ধরনের আয়োজনের শুন্যতায় মাদক, জুয়া, পর্নোগ্রাফির ছোবলে আক্রান্ত আমাদের তরুণ যুব সমাজ। এর বিপরীতে একটা পাল্টা সংস্কৃতি নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে 'শিশু কিশোর মেলা'। 'শিশু কিশোর মেলা'র উদ্যোগে গত ৩০ জুলাই, মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ টায় শিশু কিশোর মেলা নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে একাদশ শ্রেণীর নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

যাদের শ্রমে শহর পরিষ্কার হয় তারাই সমাজে অস্পৃশ্য!!

স্বাধীন বাংলাদেশে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন। এরা সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত, শহরের সমস্ত রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে কিন্তু আজও তারা বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। এভাবে এদের সারাজীবন কাজ করে যখন শেষ বয়সে আর শরীরে শক্তি থাকে না তখন খুবই দুর্দশায় কাটে বৃদ্ধাদের জীবন। অস্বাস্থ্যকর ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে অনেকে অল্প বয়সে মারা যায়।

তখন তার বিধবা স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে অত্যন্ত বিপদে পড়ে যায়। এই বয়স্ক এবং বিধবাদের জন্য বেঁচে থাকার ন্যূনতম আয়োজন করা দরকার রাষ্ট্রের। এজন্য তাদের দাবি মাসিক ন্যূনতম ৫০০০/- ভাতা, যেটা পেলে তারা বেঁচে থাকার মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। আগে হরিজনরা পড়াশুনায় ছিল পিছিয়ে। বর্তমানে হরিজন শিক্ষার্থীদের মাঝে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আছে, শুধু আর্থিক সংকটের কারণে তারা পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে না। এদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা করলে হরিজনদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয়, শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা নিয়মিত করতে পারে। এতে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে সমাজ মুক্ত হবে।

'হরিজন অধিকার আদায় সংগঠন' রংপুর জেলা ২ জুলাই ২০১৯ জেলা প্রশাসক ও সমাজসেবা অফিসারের কার্যালয়ে স্মরাকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে সংগঠনের আহবায়ক সুরেশ বাসফোর সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য শাকিল, সুজন, উদ্ধা প্রমুখ। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলার সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু।

রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে বিপ্লবী কর্মী গড়ে তোলার প্রত্যয়ে, শিবদাস ঘোষের 'বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি' বইটিকে ভিত্তি করে ঢাকা, গাজীপুর জেলায়; যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা একত্রে যশোর জেলায়; ফেনী ও চাঁদপুর একত্রে ফেনী জেলায়; সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ একত্রে সিলেটে; চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি একত্রে চট্টগ্রামে; ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ একত্রে ময়মনসিংহে পার্টির রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়।

ডুমুরিয়ায় লড়ছে কৃষকরা

২৫ জুন সম্মিলিত কৃষক সমাজের কর্মসূচি

খুলনা জেলার কৃষি প্রধান এলাকা ডুমুরিয়া উপজেলার কৃষকরা সরকার নির্ধারিত দামে (১০৪০টাকা) উপজেলাতে ধান বিক্রি করতে গিয়ে পদে পদে হয়রানির শিকার হচ্ছে। প্রথম দফায় সরকার নির্ধারিত ৬৯১টন ধান কেনায় অনিয়ম, দুর্নীতি ও হয়রানি ছিল চোখে পড়ার মত। ইউএনও এর সাক্ষর করা কৃষি কার্ড দেখিয়েও ধান বিক্রি করতে পারেনি বেশির ভাগ কৃষক। ধানের নিম্নমান (ভিজা, ধুলা, চিটার আধিক্য ইত্যাদি) দেখিয়ে খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা ইলিয়াস হোসাইন দূর দুরান্ত থেকে আসা কৃষকদের ধানসহ ফিরিয়ে দিলেও টাকার বিনিময়ে ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ট্রাক বোঝাই ধান কিনতে দেখা গেছে। বস্তার সংকট দেখিয়ে কৃষকদের ফিরিয়ে দিলেও ছুটির দিনে, অফিস টাইম শেষে ট্রাকের পর ট্রাক ধান খাদ্যগুদামে প্রবেশ করার কথা শোনা যায়।

এখানেই শেষ না, যে অল্প সংখ্যক কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে তাদের কাছ থেকেও লেবার খরচ বাবদ কৃষক প্রতি (একজন কৃষকের কাছ থেকে ৮ মন ১০ কেজি ধান নেওয়া হচ্ছে) নেয়া হচ্ছে ৫৫০ থেকে ৬০০ টাকা। ধানে একটু চিটা থাকলে সেটা বেড়ে একহাজার বারোশো টাকাও হয়ে যাচ্ছে। কৃষক না হয়েও মেম্বার, চেয়ারম্যান বা দলীয় নেতার মাধ্যমে কার্ড করিয়ে অনেক অকৃষক এসময়ে ধান বিক্রি করার সুযোগ পেলেও প্রকৃত কৃষকরা হচ্ছে বঞ্চিত। ফলে ঐ ধরনের কার্ড ১০০০/১৫০০ টাকায় কিনে নিয়ে অনেক ফড়িয়া, ব্যাবসায়ী ও এলাকার মাতব্বররা ধান বিক্রি করছে।

এ পরিস্থিতিতে প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনার জন্য 'সম্মিলিত কৃষক সমাজ' এর পক্ষ থেকে গত পচিশে জুন অভিযোগসহ উপাজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে সংকট নিরসনে তিন দফা দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। নির্বাহী কর্মকর্তা এ দাবির প্রতি একাত্মতা পোষন করে কার্যকরী উদ্যোগ নিবেন বলে আশ্বস্ত করেন এবং দ্বিতীয় দফায় ইউনিয়নে ক্রয়কেন্দ্র খুলে ধান কিনবেন বলে কৃষকনেতাদের জানান। ধান কেনায় আরো স্বচ্ছতা আনার জন্য 'সম্মিলিত কৃষক সমাজ' এর প্রস্তাবিত, প্রতিটি ইউনিয়নে কৃষক প্রতিনিধি ও কৃষি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ধান ক্রয়ের কমিটি করার প্রস্তাবেও তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সম্মিলিত কৃষক সমাজ প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে দুজন করে কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেয়। তিনিও আশ্বস্ত করেন সকল কৃষক প্রতিনিধি ও কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়ে কমিটি গঠন করে ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্রয়কেন্দ্র খুলে ধান সংগ্রহ করবেন।

অথচ হঠাৎ করেই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ১৯ জুলাই, শুক্রবার উপজেলা বসেই ধান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন এবং পরের দুদিন অর্থাৎ শনি ও রবিবারের মধ্যে নতুন করে কৃষি কার্ডে স্বাক্ষর করার ঘোষণা দেন। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে কৃষক অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ফড়িয়া ব্যাবসায়ীরা তার এলাকা থেকে কার্ড সংগ্রহ করে ইউএনও-এর কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়ে যান। এই কার্ডধারী কৃষকদের বেশীরভাগেরই ঘরে ধান নেই। আবার কার্ড থাকলেও তারা প্রকৃত কৃষক নয়। এ অবস্থায় স্বল্প টাকায় ঐ সমস্ত কার্ড সংগ্রহ করে তারা খাদ্যগুদামে দায়িত্বরত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে ধান দেয়া শুরু করে, বিপাকে পরে প্রকৃত কৃষক।

এ পরিস্থিতিতে সম্মিলিত কৃষক সমাজের পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অফিসে গিয়ে জানেন, তিনি দীর্ঘ ছুটিতে গেছেন। এদিকে কৃষকরা ইউএনও অফিসে এসে কৃষকেরা ক্ষুব্ধ। কারণ, কৃষি পরিবার না হয়েও একই পরিবারের চার জনের কার্ডে স্বাক্ষর হয়েছে, একবার ধান বিক্রি করে দ্বিতীয় দফায় আবার বিক্রি করার সুযোগ পায় অথচ কৃষকের ধান পড়ে আছে।

এমতাবস্থায় ২২ জুলাই সকাল ১২টার দিকে সম্মিলিত কৃষক সমাজ দাবি আদায়ে রাস্তা অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করে। সম্মিলিত ভাবে কৃষকেরা এসময় ইউএনও কার্যালয়ের সামনের খুলনা সাতক্ষীরার প্রধান সড়কে অবস্থান গ্রহণ করে। অধিকার বঞ্চিত এ কৃষকদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হঠাৎ পুলিশ বাধা প্রদান করেন। কৃষকদের সাথে তাদের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে এ কর্মসূচিকে পণ্ড করতে সম্মিলিত কৃষক সমাজের নেতা রুহুল আমিনকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। এ আন্দোলনের চাপে রুহুল আমিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও পুলিশ হামলা করে অবস্থানের উপর হামলার ঘোষণা দেয়। এক পর্যায়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসার ঘোষনা দিলে কৃষকেরা রাস্তা ছেড়ে ইউ এন ও কার্যালয়ের সামনে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন। এর কিছুক্ষণ পর উপজেলা চেয়ারম্যান গাজী এজাজ আহমেদ এসে কৃষকদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সকল কৃষকের ধান কেনার ঘোষণা দেন। অবশেষে ধান ক্রয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যাবস্থাপনা দূর করতে ও কৃষকদের হয়রানি থেকে বাচাতে সম্মিলিত কৃষক সমাজের পক্ষ থেকে দুই দফা দাবি সম্মিলিত স্বারক লিপি প্রদান করা হয়েছে।

দাবি সমূহ-

১. প্রতিটি ইউনিয়নে ক্রয় কেন্দ্র খুলে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করতে হবে।

২. লেবার কস্ট ৫০০ টাকা থেকে কমিয়ে একশো টাকা করতে হবে।

১ আগস্ট দুপর ১২ টা : অবিলম্বে ডেংগু প্রতিরোধে প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, উপজেলা-জেলা হাসপাতালে ডেংগু সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয় আয়োজন নিশ্চিতকরা ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার দাবিতে আজ বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ১ নং রেলগেটে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১২৯ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে খাগড়াছড়ির 'শরৎ স্মৃতি পাঠাগার' এর উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করে

ছাত্র ফ্রন্ট সংবাদ

১ জুলাই সদস্য সংগ্রহ পক্ষের উদ্বোধন

জগন্নাথ হল সম্মেলন

ঢাকা নগর সম্মেলন

ঢাকা নগর সম্মেলন

রংপুর জেলা সম্মেলন

জগন্নাথ হল সম্মেলন–
প্রথম বর্ষ থেকেই মেধা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রশাসনিক উদ্যোগে হলে বৈধ সিটের ব্যবস্থা করার, গণরুম-গেস্টরুম প্রথা উচ্ছেদ করে ছাত্র নির্যাতন বন্ধের এবং ক্যান্টিনগুলোতে খাবারের মান বাড়ানো ও দাম কমানোর দাবিতে আজ ৩ আগস্ট ২০১৯ শনিবার সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ হল শাখার ৩য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অপু রায়কে সভাপতি ও সন্দীপ কুমার বর্মণকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

ঢাকা নগর সম্মেলন–
১১ জুলাই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢাকা নগর শাখার ৩য় সম্মেলন অুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাসুদ রানা। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার। রাফিকুজ্জামান ফরিদকে সভাপতি ও অরূপ দাস শ্যামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

রংপুর জেলা সম্মেলন–
১৭ জুলাই পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে ৪র্থ সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মাসুদ রানা। আলোচক ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ, বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু। আবু রায়হান বকসীকে সভাপতি ও নিরঞ্জন রায়কে সাধারণ সম্পাদক করে দশ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

সাম্যবাদ

৩-এর পৃষ্ঠার পর

এ দলেরও তিনি প্রধান হন এবং তাঁর সঙ্গে থাকেন খান আবদুল গাফফার খান, জি.এস. সৈয়দ, মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, আবদুস সামাদ আচকজাই, মাহমুদুল হক উসমানী, মাহমুদ আলী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, হাজি দানেশ প্রমুখ।

ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হলেও পাঞ্জাবিরা ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের ষড়যন্ত্র শেষ হলো না। তাঁরা শুরু করলো বাংলা ভাষাকে 'মুসলমানি' করার ষড়যন্ত্র, কখনো-বা আরবি হরফে বাংলা লেখার চক্রান্ত। সেটাও যখন সম্ভব হচ্ছিলো না তখন উপযুক্ত বাংলা শব্দের পরিবর্তে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা: যেমন রেডিও পাকিস্তানে ও পাকিস্তানপন্থী পত্র-পত্রিকায় 'মন্ত্রী', 'মুখ্যমন্ত্রী', 'প্রধানমন্ত্রী'র পরিবর্তে 'উজির', 'উজির আলা', 'উজিরে আজম' লিখতো। শব্দগুলো শুধু যে বিজাতীয় তাই নয়, এতো সেকেলে যে মনে হয় রূপকথার দেশের ভাষা।

পাকিস্তানিদের মনোবৃত্তি অজ্ঞাত ছিলো না বাঙালি প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের। তাঁরাও নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষাকে স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামের অংশ রূপে গ্রহণ করেন। বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি যতোই পাকিস্তানিদের সন্দেহ ও ষড়যন্ত্র তীব্র হচ্ছিলো ততোই এ দেশের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীগণ তাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। বাঙালি সংস্কৃতি-ভাষা-শিল্প-সাহিত্য নিয়ে ঔপনিবেশিক শাসক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত চলতে থাকে। পাকিস্তানিরা বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতি এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে বরং বেশিই ক্রুদ্ধ ছিলেন তার প্রমাণ মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতিসেবী ও বুদ্ধিজীবীদের তারা বাড়ি বাড়ি খুঁজে বের করে হত্যা করেছে, তুলনায় রাজনীতিকরা, সম্ভবত অতি সাবধানে থাকার কারণেই, নিহত হয়েছেন সামান্য।

মওলানা ভাসানীই ছিলেন পূর্ববাংলার একমাত্র নেতা যিনি সংস্কৃতিকে তাঁর রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখেননি। আমৃত্যু তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য ভেবেছেন এবং সাধ্যমতো কাজ করেছেন। সেই আসাম-যুগ থেকেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক সভাসমাবেশ ও কৃষক-সম্মেলনগুলোর সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত রাখতেন নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এমনকি তাঁর আয়োজিত ধর্মীয় সভাগুলোতেও অনেকসময় সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখতেন। সারা জীবন তিনি তাঁর জনসভাগুলোয় ভাষণ দেবার জন্যে প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো যেমন উচ্চশিক্ষিত নাগরিক সংস্কৃতিসেবী ও বুদ্ধিজীবীদের, তেমনি প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ শিল্পীদের।

দীর্ঘজীবনে ভাসানী অসংখ্য সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, কিন্তু তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি, এদেশের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' যা 'কাগমারী সম্মেলন' নামে পরিচিত। এটি পূর্ববাংলার সর্বকালের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই শুধু নয়, এদেশের জাতীয় রাজনীতিতে এর তাৎপর্য অনাগত কালের গবেষকদের কাছে স্বীকৃত হবে। আবু জাফর শামসুদ্দিন কাগমারী সম্মেলন সম্পর্কে এক বিশ্লেষণে লিখেছেন:

"... পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সভাপতিরূপে মওলানা ভাসানী সাহেব সম্মেলন আহ্বান করেননি। মওলানা সাহেবের উদ্যোগ এবং নির্দেশেই সম্মেলন আহ্বান করা হয় বটে, কিন্তু তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপে নয়। ... মওলানা ভাসানীও সম্মেলনের সঙ্গে আওয়ামী লীগকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করেননি। তথাপি সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত এবং অনুষ্ঠিত কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক-কাম-রাজনৈতিক সম্মেলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ... কাগমারীতে প্যান্ডেল নির্মাণ, অস্থায়ী বাসস্থান এবং কর্মী ও মেহমানদের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য মওলানা সাহেবের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে অসংখ্য কর্মীর দিবারাত্র পরিশ্রমে নিষ্পন্ন হয়েছিলো। টাঙ্গাইল শহর হতে কাগমারী পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাইল দীর্ঘ রাস্তা অসংখ্য তোরণে সজ্জিত হয়েছিলো। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামকারী অবিভক্ত ভারতের প্রধার প্রধান সৈনিক ও নেতাদের নামে তোরণ উঠেছিলো। যতদূর মনে পড়ছে তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যারিস্টার আবদুর রসুল প্রমুখের নামবহনকারী তোরণও ছিলো। ১৯১৯-২১ এবং ১৯৩০-৩২ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের প্রতি মওলানা ভাসানী বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। ..." (আবু জাফর শামসুদ্দিন, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫৭। স্মৃতিচারণ, *দৈনিক সংবাদ*, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২; *ভাসানী*, পৃ. ১৭৫)

... কমিউনিস্ট নেতা নূরুল হক চৌধুরী (কমরেড মেহেদী) তাঁর এক স্মৃতিচারণে বলেছেন: "আমি ডেলিগেট হিসেবে সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। টাঙ্গাইলে ঢুকেই দেখি হজরত মোহাম্মদ তোরণ, তারপর তোরণ আর তোরণ। গান্ধী তোরণ, মওলানা মোহাম্মদ আলী তোরণ, নজরুল তোরণ, ইকবাল তোরণ, নেতাজী সুভাষ বসু তোরণ, হাজী শরিয়ত তোরণ, তিতুমীর তোরণ, নেহেরু তোরণ, হাজী মোহাম্মদ মোহসীন তোরণ, সি. আর. দাস তোরণ, লেনিন তোরণ, স্ট্যালিন তোরণ, মাও সে-তুঙ তোরণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ, শেলী, হালী, রুমি, ইমাম আবু হানিফা, গাজ্জালী তোরণ, টাঙ্গাইল থেকে সন্তোষ পর্যন্ত মোট ৫১টি তোরণ। সর্বশেষ আর সর্বপ্রথম তোরণ ছিল কায়েদ-ই আযম তোরণ। সন্তোষে পৌঁছে দেখি এলাহী কাণ্ড। ... সন্তোষে কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিলো এবং সম্মেলন চলছিল ৬ দিন[সাংস্কৃতিক ও আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনসহ]।"... (নূরুল হক চৌধুরী, শতাব্দীর উজ্জ্বল সূর্যের আকর্ষণে, *প্রাচ্যবার্তা*, মওলানা ভাসানী স্মরণিকা সংখ্যা ১৯৭৭; *ভাসানী*, পৃ. ১৭৫)

... এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বিদেশি অসরকারি প্রতিনিধিদের শুধু নয়, ভাসানী আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রনায়কদের। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের, চীনের একজন উপপ্রধানমন্ত্রী (নামটি জানা যায়নি), ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ সুকার্ণো অথবা তাঁর কোনো প্রতিনিধি, পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এবং ব্রিটিশ বিরোধী দলের নেতা। নেহেরু, বিধান রায় ও নাসের চিঠি দিয়ে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে মওলানাকে ব্যক্তিগত চিঠি দিয়েছিলেন, ...। পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাকিস্তান এবং পশ্চিবঙ্গের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের সংখ্যাহীন ব্যক্তি। সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেক দেশের আমন্ত্রিতরা এতে যোগদান করতে পারেননি। সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের সরকারের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর বিশেষ ভালো সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এই দুই দেশের কোনো কবি-সাহিত্যিক এই সম্মেলনে যোগদান করতে পারেননি। সে জন্য তাঁরা অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে পাঠিয়েছিলেন বাণী অথবা মওলানার কাছে ব্যক্তিগত পত্র।

... ৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল তিনটেয় সম্মেলনের মূল সভাপতি ড. কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খোলা মাঠের মধ্যে অনুষ্ঠান। তিন দিকে লক্ষ লক্ষ শ্রোতা। ... অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা ভাসানী লক্ষ লক্ষ জনতার উদ্দেশে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। আবু জাফর শামসুদ্দিন লিখেছেন: "বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির উদ্দেশে তাঁর সুবিখ্যাত 'সালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করেন। ঐ সালামু আলাইকুম তাৎপর্য উপস্থিত শ্রোতা এবং যাঁদের উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছিলো তাঁরা উভয় পক্ষই উপলব্ধি করেছিলেন। আমার ক্ষুদ্র মতে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম স্পষ্ট দাবি এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রাম ও ত্যাগের সংকল্প ঐ 'সালামু আলাইকুম' ধ্বনিত হয়েছিলো।" [সূত্র: দৈনিক সংবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২]

... সম্মেলনে স্বাগত ভাষণে ভাসানী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দু'ধরনের বক্তব্যই রাখেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে যে-সকল দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেগুলোতে জনসাধারণের দীর্ঘ ঔপনিবেশিকতাবিরোধী এতিহ্য রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজ সকল উন্নয়নকামী দেশের উচিত পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা। এবং এই ঘনিষ্ঠতা অর্জনে সে-সব দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। ... আজ পৃথিবীর নানা দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি বিরাজ করছে তা দূর করতে পারেন শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ। তিনি উল্লেখ করেন বার্ট্রান্ড রাসেল, পাবলো নেরুদা, ম্যাক্সিম গোর্কীর মতো প্রগতিশীল, শান্তিবাদী ও মানুষের কল্যাণকামী লেখকদের কথা। উপমহাদেশের হিন্দুমুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার ওপর তিনি দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। ... এই অঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি ভারত-পাকিস্তান বন্ধুত্ব – দুই দেশের জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়: "প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন ... রমেশ শীল, তসের আলী, মোসলেম, রাম সিং, মজিদ মিয়া, সুখেন্দু চক্রবর্তী, আব্বাস উদ্দিন, বেদারুদ্দিন, সোহরাব হোসেন প্রমুখ ছাড়াও ঢাকা রেডিওর শিল্পীবৃন্দ; চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ঢাকা, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার নানা স্থান হতে আগত শিল্পীর দল; লালন শাহ দল, পশ্চিম পাকিস্তানি লোকনৃত্য দল, মাদাম আজুরী ও তাঁর দল, এবং বহু একক শিল্পী ও গায়ক-গায়িকা। তা ছাড়া নানারকম কুটিরশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের একটি সুন্দর প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিলো।" (ভাসানী, পৃ. ১৭৯)

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলো সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে এটি হয়ে থাকলো একটি মাইলফলক – বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা।

৬০-এর দশকের রাজনীতিতে ভাসানী

রাজনৈতিক নেতাদের অনৈক্যের কারণে ধীরে ধীরে পাকিস্তানে সামরিক শাসনের পথ তৈরি হয়। ১৯৫৯-এর প্রথম দিকে দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ এক পাঁচ-দফা চুক্তির ভিত্তিতে পুনরায় মৈত্রী গড়ে তোলে। পাকিস্তানিদের ধারণা হয় – নির্বাচনের আগে যদি এই দুই জনপ্রিয় দল ঐক্যবদ্ধ থাকে তবে মুসলিম লীগের পরাজয় অনিবার্য এবং পাকিস্তানের নেতৃত্ব বাঙালিদের হাতে চলে আসবে। তাই অতি দ্রুত সামরিক শাসন জারির ষড়যন্ত্র করা হয়। ৭ অক্টোবর '৫৮ দিনগত রাতে মির্জা-আইয়ুব দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। ... ১২ অক্টোবর '৫৮ ভাসানীকে গ্রেফতার করা হয়। আরো বহু নেতা কারারুদ্ধ হন। মির্জাও রেহাই পেলেন না। ২৭ অক্টোবর '৫৮ তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরিয়ে আইয়ুব পূর্ণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন, কারণ সেনাবাহিনী তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিলো। ...

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন দুটি সমান্তরাল ধারায় বিভক্ত ছিলো: একটি সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদবিরোধী স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন যা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে তার নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী। অপরটি সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদ নিয়ে বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষাকারী স্বায়ত্তশাসনের ধারা। '৬৬ সাল থেকে এই ধারাই বাঙালি উঠতি পুঁজিপতিদের সমর্থনে ব্যাপক আকার ধারণ করে। ছয়-দফাপন্থী আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী মুখপাত্রে পরিণত হয়। ...

... কোনো জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের যে অধিকার তা অর্থনৈতিক শোষণমুক্তির সংগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয় – সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা না বলে শুধু জাতীয়তাবাদের স্লোগানে জাতির ও জনগণের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়, তা ভাসানী পঞ্চাশের দশক থেকেই অব্যাহত বলে এসেছেন। পরবর্তীতে তাঁর কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে। ...

আইয়ুব বছর চারেক সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী সামরিক আইনে দেশ শাসন করে '৬০-এর দশকে যে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, যার নাম দেন তিনি 'মৌলিক গণতন্ত্র', তা কোনো অর্থেই গণতন্ত্র ছিলো না। ক্ষমতায় আসার বছর তিনেকের মধ্যে তিনি তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি শক্ত করে ফেলেন। এই সময় ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীসহ বহু রাজনৈতিক নেতা ছিলেন কারাগারে। তারপর ১৯৬২ থেকে ছাত্ররা আইয়ুবের শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে যে-সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন তা পরবর্তী বছরগুলোয় ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-রাজনীতিকদের দ্বারা আরো গতিশীল হয়। অপর দিকে আইয়ুবশাহীও জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতে থাকে নির্মমভাবে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারগুলো ভরে যায় প্রগতিশীল ছাত্র-শ্রমিক কৃষক ও রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের দ্বারা। ... একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া তৎকালীন পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের জনগণের পাঞ্জাবিদের প্রতি ঘৃণা ছিলো সীমাহীন। কিন্তু আইয়ুব ছিলেন পাঠান – একটি অনগ্রসর এলাকার অধিবাসী। তাই প্রথম দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুন্নত অঞ্চলগুলোর মানুষ তাঁর সম্পর্কে কিছুটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতো। নানা কৌশলে প্রথমদিকে পূর্ব পাকিস্তানেও তিনি কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এই জন্যে যে, জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করলেও, রাজনৈতিক নেতাদের অন্তরীণ করে রাখলেও, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকনেতাদের হয়রানি করলেও, তাঁর সময়ই এক ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ হতে থাকে। বৈদেশিক ঋণের সাহায্য দ্বারা হলেও সমাজের উপরিকাঠামোর কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, শিল্পকারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়, যে-ধরনের 'উন্নয়ন' স্বাধীনতাপরবর্তী একযুগে মানুষ লক্ষ্য করেনি। তাঁর সময় সামরিক খাতে ব্যাপক ব্যয় করা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে কিছুটা চাঙ্গাভাব বিদ্যমান ছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন ছিলো একেবারেই দৃষ্টিগ্রাহ্য, পূর্ব বাংলায় ততোটা নয়, তবু নানা কারণে পাকিস্তানের দুই অংশের ভেতরকার বৈষম্য বাড়তে থাকে। সে-জন্য বাংলাদেশে অসন্তোষও বাড়তেই থাকে।

১৯৬৩-র মার্চে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন বসে তাতে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈষম্যের বিষয়টি নিয়ে অতি উত্তপ্ত আলোচনা হয়। বৈদেশিক সাহায্য, চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে শুধু পরিষদের মধ্যে নয়, বাইরেও ছাত্র-যুবক-জনতা প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। উদাহরণস্বরূপ : ১২ মার্চ জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরা বলেন: সরকারি চাকরিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের হার যথাক্রমে ১২০ : ৬৭০।[১০] ২১ মার্চ '৬৩ পরিষদে বিরোধী দলের উপনেতা ন্যাপের মশিউর রহমান আইয়ুবকে 'ডিক্টেটর'[১১] বলে অভিহিত করে সমালোচনা করেন।

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা এমন হলেও বৈদেশিক ক্ষেত্রে আইয়ুব সরকারের কিছু কিছু পদক্ষেপ ছিলো সে-সময়ে উল্লেখযোগ্য: সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন। ১৯৬৩-র মার্চে পাক-চীন সীমান্ত চুক্তিসহ দুই দেশের মধ্যে নানা অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বের দুই প্রধান সমাজতন্ত্রী দেশ রাশিয়া ও চীনের নেতা ও কর্মকর্তারা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, আইয়ুবও এই দুই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেন। ... এশিয়ায় আমেরিকার ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারের প্রেক্ষিতে ভাসানী চাইতেন পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ভারতের এবং এই চার দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হোক। পাক-চীন সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ ব্যাপারে তিনি আইয়ুব সরকার কর্তৃক ব্যবহৃতও হন। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তিনি ব্যবহৃত হননি, দেশের স্বার্থেই তিনি যা ভালো মনে করেছেন তাই করেছেন।

১৯৬৪-৬৫ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আইয়ুবের সম্পর্কের সামান্য অবনতি ঘটে, পক্ষান্তরে পিকিং ও মস্কোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো হয়। '৬৫-র এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই পাকিস্তানে সরকারি সফরে আসেন। কয়েকদিন পরেই আইয়ুব যান মস্কো। পক্ষান্তরে আইয়ুবের পূর্ব নির্ধারিত যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিল করা হয়। কারণ আইয়ুব সরকার ভিয়েৎনামে মার্কিন হামলার নিন্দা করেন। আইয়ুবের এই মার্কিনবিরোধিতার মৃদু সাহসকে ভাসানী প্রশংসা করেন এবং বলেন : 'ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন দেবে এমন যে-কোনো সরকারের বৈদেশিক-নীতির তিনি সমর্থন দেবেন। আইয়ুব যদি তাঁর এই নীতি অব্যাহত রাখেন তা হলে তাঁকেও সমর্থন দিতে তিনি প্রস্তুত।'[১২] ভাসানীর মতো নেতার মুখ থেকে এ ধরনের কথা উচ্চারিত হওয়ায় আইয়ুবের উপকার হয়, পক্ষান্তরে ভাসানী হন দেশের মধ্যে তাঁর প্রতিপক্ষের দ্বারা কঠোর সমালোচিত।

এরমধ্যে আইয়ুব যখন সমাজতন্ত্রী শিবিরের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকেছিলেন তখন তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য পাক-ভারত যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া হয় সেপ্টেম্বর '৬৫তে। এই যুদ্ধের জন্য ভাসানী যতো না ভারতকে নিন্দা করেছেন তার চেয়ে বেশি করেছেন মার্কিন সরকারকে। কারণ তাঁর এবং আরো অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, এই যুদ্ধের মূলে ছিলো মার্কিন সরকার। বার্ট্রান্ড রাসেলসহ পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীরাও তাই মনে করতেন।

কিন্তু যুদ্ধের সংকট কাটিয়ে উঠতেই সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর প্রতি আইয়ুবের ভালোবাসার ছদ্মবেশ খুলে যায় এবং তাঁর মার্কিনপন্থী চেহারা পুনরায় প্রকাশ্য আকার ধারণ করে। ডিসেম্বরে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। তখন আমেরিকান নেতারা তাঁর খুব প্রশংসা করেন। আইয়ুব যে বিশ্বাসঘাতক এবং মার্কিনের একান্ত দালাল তা অবগত হওয়া মাত্র ১৯৬৫-র ডিসেম্বর থেকে ভাসানী তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার উপায় খুঁজতে থাকেন।

ভাসানীর প্রতিপক্ষরা তাঁর সংগ্রামী চরিত্রকে হনন অথবা জখম করার জন্য যে অস্ত্রটি মধ্য ৬০ থেকে বহুদিন ব্যবহার করে এসেছেন এবং আজো করেন সেটি হলো : আইয়ুবের প্রতি তিনি নমনীয় ছিলেন, যখন তাঁর বিরুদ্ধে দেশে ছিলো গণ-অসন্তোষ। ভাসানী নাকি বলেছেন : Don't disturb Ayub। ভাসানী যে আইয়ুব সরকারের বৈদেশিক নীতির প্রতি কিছুকাল নমনীয় ছিলেন এতে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর অভ্যন্তরীণ অগণতান্ত্রিক নীতির তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক। Don't disturb Ayub কথাটি তিনি কখন কোথায় কার কাছে বলেছিলেন এবং তা কোন্ পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়েছিলো তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু তাঁকে 'আইয়ুবের দালাল' বলে গালিগালাজ করা হয়েছে। তিনি তাঁর সমালোচকদের কথায় কখনোই বিচলিত হতেন না।

... ভাসানী আইয়ুবের পররাষ্ট্র নীতিকে কিছুদিন সমর্থন দিয়েছেন ... তবে আইয়ুবের অভ্যন্তরীণ একনায়কত্ববাদী নীতির তিনি অনবরতই সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন। আইয়ুবের আমলে ন্যাপের বিপুলসংখ্যক কর্মী ও নেতা কারা নির্যাতনও ভোগ করেন। (পৃ-২৬৪) ... ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর সম্মিলিত মোর্চার প্রার্থী হন ফাতেমা জিন্নাহ ... বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের তৎপরতা ছিল সবচেয়ে বেশি; সারাদেশে সংখ্যাহীন সভা-সমাবেশে তাঁরা ভাষণ দিতে থাকেন। (পৃ-২৭২)

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান আক্রান্ত হলেও পূর্ব পাকিস্তানও তাতে মানসিকভাবে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। (পৃষ্ঠা-২৮১) ... ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান প্রকাশ করেন 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি।'(পৃ-২৮৮) ... কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটি প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয় এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ... 'ছয় দফায় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা নাই এবং কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের অধিকারের কোনো স্বীকৃতি নাই' বলে ভাসানী ছয় দফা-কে সমালোচনা করেন। অবশ্য স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে ছয় দফা গতিবেগ সঞ্চার করায় তিনি আর পরে এটির সমালোচনা করেননি।

... আড়াই মাসের মধ্যে অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার হন। তাদের মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগ ৭ জুন দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়। ওইদিন পুলিশের গুলিতে ১৩জন নিহত হন। তাতে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা অসামান্য বেড়ে যায়।(পৃ-২৮৪) ... ভাসানী ৭ জুনের সরকারি বর্বরতায় নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করেন। (পৃ-২৯১) ... ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে কারাবন্দী শেখ মুজিবসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হলে ভাসানী ... স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে একটি গণতান্ত্রিক ঐক্যফ্রন্ট গঠনের জন্য তিনি আহ্বান জানান। (পৃ-৩০৯)

(সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত 'মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী' গ্রন্থের উপসংহার অধ্যায়ের ৬১৭-৬৪৫ পৃষ্ঠা এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ১৭৮-১৯০ পৃষ্ঠা থেকে কিছুটা সংক্ষেপিত আকারে উদ্ধৃত। অনুচ্ছেদ ভাগ ও শিরোনাম আমাদের।)

আমাদের বদলে যাওয়া

বয়স বেশি নয়। তারা তরুণ। এই বয়সে তাদের লেখাপড়ায় মনযোগী থাকার কথা। নিজেকে গড়ে তোলার জন্য খেলাধূলা করার কথা, বিতর্ক করার কথা, গান শেখার কথা। কিন্তু তারা কেউ লেখাপড়ায় মনযোগী হয়নি। বিতর্ক শেখেনি, গলায় গান তুলেনি। হাতে অস্ত্র তুলেছে। বাস্তবে অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

খুন আগেও হয়েছে, তবে এমন খুব একটা নয়। এর আগে এই প্রক্রিয়ায় আমরা বিশ্বজিতের খুন দেখেছিলাম। তারা যুবক ছিল, সরকারি দলের ক্যাডার ছিল। এরা তুলনামূলকভাবে কমবয়স্ক, তরুণ। দেশের কিশোর-তরুণরা অল্প বয়সে অপরাধী হচ্ছে। নির্মম আনন্দ, বীভৎস মজায় মজে যাচ্ছে। অল্পবয়সী ছেলেরা কিশোর গ্যাং তৈরি করে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে, বন্ধুকে খুন করছে, মেয়েদের ধর্ষণ করছে। এরা ভাল মনের নয়, পরিবার থেকে তারা কিছু শেখেনি, তারা বখে গেছে, কথা শোনেনা– এ কারণে কি এমন হচ্ছে? এটা কি কেবলমাত্র একটা পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপার, নাকি এর কোন আর্থসামাজিক কারণ আছে? সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপারও কি দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু?

পারিবারিক ও মানবিক সম্পর্কগুলো ভেঙে পড়েছে

আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কিংবা ভায়ে ভায়ে সম্পর্কও আজ তার মাধুর্য্য পরিত্যাগ করেছে। একান্নবর্তী পরিবার ভাঙা শুরু হয়েছে অনেক আগেই, অর্থনৈতিক নিয়মেই। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারটাই সব নয়, এসব সম্পর্কে নৈতিক জায়গা বলে একটা ব্যাপার থাকে। চুলা আলাদা হলেও আগে দেখা যেত বাড়ির বাচ্চাদের সে ব্যাপারে তেমন কড়াকড়ি নেই। কখনও সে মায়ের হাঁড়িতে, কখনও সে চাচীর হাঁড়িতে খাচ্ছে। সে দিনও গেছে। কয়েকদিন আগের খবর, কুমিল্লায় এজলাস থেকে তাড়া করে বিচারকের কক্ষে নিয়ে গিয়ে ফুফাতো ভাইকে হত্যা করেন আসামী হাসান। তিনি ও তার ফুফাতো ভাই ফারুক একই হত্যা মামলার আসামী ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের একজনের নানা ও অন্যজনের দাদা হাজী আব্দুল করিমকে তারা দুই ভাই মিলে খুন করেছেন।

এ ধরনের ঘটনা চিন্তার উদ্রেক না করে পারে না। এই ঔদ্ধত্য ও উন্মত্ততা কিছুদিন আগেও বিরল ছিল, এখন অহরহ। বৃদ্ধা মাকে পিটিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দেয়া, বৃদ্ধ বাবাকে মারতে মারতে একেবারে খুনই করে ফেলা, শিশুদের পিটিয়ে হত্যা করা, পেটানোর ভিডিও পোস্ট করা– এসব ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকায় আসছে। ফেসবুকে কিংবা ইউটিউবে আপলোড করা এসব ভিডিওর দর্শকও কম নয়। অনেকেই দেখছেন। 'এত নিষ্ঠুর যে দেখা যায়না', 'এত নোংরা যে শোনা যায় না' – এই বাক্যগুলো আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। আগে অনেকেই ছোট ছেলেমেয়েদের না খেতে পাওয়া শুকনো মুখ দেখে থাকতে পারতেন না। সিনেমায় এরকম দৃশ্য দেখলেও কেঁদে গায়ের কাপড় ভিজিয়ে ফেলতেন। বাস্তব জীবনে ঘরের পাশে কিংবা রাস্তায় দেখলে ছুটে গিয়ে সাহায্য করতেন। সেই সময় এখন নেই। কান্নার সিনেমা এখন চলে না। এ্যাকশন, রোমান্টিক আর কমেডির যুগ এখন। এখন ঘরে ঘরে দম আটকানো কান্না, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। প্রকাশিত হলে স্নেহ-ভালবাসার চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে রাখারও কেউ নেই। মানসিক দিক থেকে চূড়ান্ত অভাবী, অবলম্বনহীন ও শেকড়হীন লক্ষ লক্ষ পরিবারের জন্ম হচ্ছে প্রতিদিন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এদের মধ্যে চলছে প্রবল টিকে থাকার প্রতিযোগিতা। এই টিকে থাকার প্রতিযোগিতার কারণে প্রতারণা, লোককে ঠকানো এসব এতো বেড়েছে যে কেউ সাহায্য চাইলে সে সত্যিই অসহায় কিনা একথাও অনেকে এখন যাচাই করে নিতে চান। একারণে রাস্তায় ভিখারি ভিক্ষা চাইলে পাল্টা প্রশ্ন করেন, খোঁড়া লোককে পরীক্ষা করে দেখেন সে আসলেই তা কিনা। অসহায় লোকের দুঃখের বিবরণ বিশ্বাস করেন না। সন্দেহপ্রবণ মন এই সময়ের মননজগতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আমাদের মা ও বোনেরা

একাত্তরে দেশের মা-বোনেরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছেন। প্রত্যক্ষ লড়াই করেছেন, ইনফরমার হিসেবে কাজ করেছেন। লক্ষ লক্ষ মেয়েরা ধর্ষিত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। মায়ের সামনে তাঁর শিশুসন্তানকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে মিলিটারিরা, তবু মা মুক্তিবাহিনীর খোঁজ দেয়নি। সেই একই দেশে সাত বছরের শিশু সায়মাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হল। গত ৬ মাসে ৬৩০ জন নারী ও ২৫৮ জন শিশু ধর্ষিত হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে অন্তত ১০৫ জন নারী ও ৪৩ জন শিশু ধর্ষিত হয়েছেন। বাসে, ট্রেনে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, ঘরের ভেতরে কোথাও মেয়েরা নিরাপদ নয়, কোথাও তারা স্বস্তিতে নেই। পাশে যে দাঁড়ায় সে বাবার মতো, তবে বাবা নয়; ভাইয়ের মতো, তবে ভাই নয়। তার পরিচয় সে পুরুষ। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম তো হওয়ার কথা অস্বাভাবিকতার, অমানবিকতার। অথচ আজ স্বাভাবিকতাই ব্যতিক্রম। সহানুভূতি ও মমত্ব প্রদর্শনের মতো সাধারণ মানবীয় গুণাবলী আজ যেন মহৎ চরিত্রের কাজ। কাজ শেষে বাড়ি ফেরত মেয়েরা তাদের চলাচলের সীমার মধ্যে কাউকে খুঁজে পায়না যার দিকে পরম ভরসায় তাকানো যায়। নির্যাতনের কোন বিচার হয় না, অপমানের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। বিচার চাইলেই প্রশ্ন ওঠে, সন্ধ্যার পরও বাইরে কেন কিংবা ওই রাস্তায় গেলে কেন? এডিস মশা থেকে শুরু করে পাড়ার মাস্তান সবার ব্যাপারেই সাবধান থাকো। সাবধান থাকাই পরিবারের নির্দেশ, রাষ্ট্রের পরামর্শ। ব্যক্তি তুমি সাবধান হও, রাষ্ট্র কোন দায়িত্ব নেবে না– এটাই পুঁজিবাদী সমাজে জনগণের ভোট ও ট্যাক্সের সম্মানজনক প্রতিদান।

আইনের চোখে সবাই সমান– তাই কী ?

গণতন্ত্রের উন্মেষকালে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় এই কথা এসেছিল যে, 'আইনের চোখে সবাই সমান'। কিন্তু আজ এ বাক্য অকার্যকর। প্রকাশ্যে খুন করা এই কিশোর তরুণরা জানে তাদের হাতে খুন হলে তার বিচার হবে না। যারা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে তারাই তাদেরকে রক্ষা করবে। বিশ্বজিৎ হত্যা মামলার রায় বের হলো কিছুদিন আগে। নিম্ন আদালত আটজনের ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন, উচ্চ আদালত তার ছয়জনকে রেহাই দিলেন। প্রকাশ্য রাস্তায় তামিল সিনেমার দৃশ্যের মতো খুন করা হল, তার ছবি উঠল, পত্রিকায় খুনিদের পরিচয় ঠিকানাসহ প্রকাশিত হল। সেই খুনের মৃত্যুদণ্ড থেকে আইনি পথেই দু'জন বাদে সবাই রেহাই পেয়ে গেলেন। পুলিশ হত্যাকাণ্ডের আলামত ঠিকমতো সংরক্ষণ করেনি, এমনকি পোস্ট মর্টেম রিপোর্টও ঠিকঠাক করা হয়নি– এসব দেখে আদালত পুলিশকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন।

মানুষ প্রতিটি ঘটনা থেকে শেখে। সে শিখেছে যে, এসকল খুনের কোন বিচার হয় না। এজন্য তারা এই খুনিদের ভয় পায়। তাদেরকে খুন করতে দেখলে কেউ আটকানোর জন্য এগিয়ে যায়না। মানুষের মধ্যে ভয় কাজ করে। বিচারহীনতাই এই ভয় সৃষ্টি করেছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি আর ভয়ের সংস্কৃতি– এই দুই সংস্কৃতি তাদেরকে নির্বাক করে রেখেছে।

প্রতিটি অন্যায়-অপকর্মের সাথে সরকারি দল যুক্ত। আওয়ামী লীগের সমর্থন তাদেরকে প্রতিপত্তিশালী করে। অভাবনীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি তরুণ-যুবকদের চরিত্রকে করে লাগামছাড়া। বিরাট সংখ্যক বেকার যুবকরা সরকারি দলের ক্যাডার হয়ে কাজ করে। এদেরকে শাসকশ্রেণির দল সময়মতো কাজে লাগায়, তাদেরকে ভয়ঙ্কর চরিত্র হিসেবে মানুষের সামনে নিয়ে আসে, তাদের দিয়ে এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তারা পাড়ায় ঘর বানানো, দোকান ভাড়া দেয়া থেকে শুরু করে বিয়ে–মুখেভাত পর্যন্ত সকল ব্যাপারে মাথা গলায়। এলাকায় মাদকের ব্যবসা তাদের হাত দিয়ে হয়। তাদের পকেটে কাঁচা টাকা আসে আসে। অল্প বয়সে তারা হাল ফ্যাশনের বাইক চালায়, দামী রেস্টুরেন্টে খায়। তাদের দাপটে এলাকা কাঁপে। প্রত্যেকটি এলাকায় সুসংহত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে আওয়ামী লীগ তার দশ বছরেরও বেশিসময়ের এই শাসনামলে। এদের বিচার হয় না। আবার কখনও পত্রপত্রিকার আসার কারণে কিংবা সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণহীন কর্মকাণ্ডে প্রশ্নের মুখে সরকার পড়ে গেলে তাদের জন্মদাতারা অবলীলায় তাদের ঝেরে ফেলে দেয়। এর জন্য বেশি পিছনে যাওয়ার দরকার নেই। এই ক'দিন আগে রিফাত হত্যার অন্যতম আসামী নয়ন বন্ডকে ক্রসফায়ারে মেরে ফেলার ঘটনা স্মরণ করলেই হবে। এটা আরেক দেশ, সেখানে হাজারে হাজারে সন্ত্রাসী সৃষ্টি করা হয়, ধ্বংস করা হয়, সৃষ্টিকর্তা থাকেন অদৃশ্য। কিশোর নয়নকে নয়ন বন্ড হিসেবে জন্ম দিয়েছে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা, মেরেছেও তারাই।

কেন ঘটছে এসব?

আমরা বলেছিলাম বিচারহীনতা ও ভয়ের সংস্কৃতি সামাজিক প্রতিরোধশক্তিকে অনেকখানি স্থিমিত করেছে। এই খোলা রাস্তায় কোপানোর আরেকটা প্রভাব আছে। দাস বিদ্রোহ দমন করার পর বিদ্রোহীদের মেরে রাস্তায় ক্রুশবিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, যাতে অন্য দাসরা দেখে বুঝতে পারে বিদ্রোহের শাস্তি কী হতে পারে। প্রকাশ্য রাস্তায় কোপানো কিংবা পিটিয়ে মেরে ফেলা, তারপর বিচার না হওয়া– এসকল ব্যাপার একটা ছোট বার্তা দেয় মানুষের কাছে। দেখ, তুমি বিদ্রোহ করলে তোমার অবস্থা কী হতে পারে। প্রতিবাদের পরিণতি কী তুমি বুঝে নাও।

কিন্তু এই অন্যায়, অত্যাচার, অসাম্য, তীব্র অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ ও দৈনন্দিন এই অসহনীয় অপমান কি ভুলে যায় মানুষ? ভুলে না। তীব্র ক্ষোভ জমা হতে থাকে ভেতরে ভেতরে। সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ফুঁসতে থাকে সে কিন্তু বিদ্রোহের রাস্তা পায় না।

এই মানুষেরা তাদের এই ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঘটাচ্ছে ক্ষুদ্র শত্রুর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বেশ কয়েকবছর আগে দেখা গিয়েছিল যে ধরা পড়ার পর পকেটমারকে উত্তেজিত জনতা পুড়িয়ে মারছে। এরকম কয়েকটি ঘটনা পরপর ঘটেছিল। গত কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, গণপিটুনিতে নির্বিচারে মানুষকে খুন করা হচ্ছে। গত ছয়মাসে গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন ৩৬ জন। জুলাইয়ের ২৪ তারিখ পর্যন্ত সেটা গিয়ে ঠেকেছে ৪৩ জনে। এ আরেক চিত্র!

রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান আজ মানুষের আস্থা হারিয়েছে। মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই। প্রকাশ্য রাস্তায় খুন হয়। অপরাধী প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়ায়। যারা খুনিকে ধরবে সেই পুলিশ-র‍্যাবের বিরুদ্ধে রয়েছে খুন-ছিনতাই-চাঁদাবাজীর অভিযোগ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকেরা এখন টাকা নিয়ে খুন করেন অর্থাৎ খুনের কন্ট্রাক্ট নেন। দেশের বিচারব্যবস্থা প্রধান বিচারপতিকেই সুবিচার দিতে পারেনি। উপরন্তু উচ্চ আদালতে বড় বড় অপরাধীর জামিন হচ্ছে, তারা না পারলে দেশের রাষ্ট্রপতি নিজ ক্ষমতাবলে খুনের আসামীর সাজা মওকুফ করে দিচ্ছেন। পার্লামেন্টে বসে যারা আইন প্রনয়ণ করেন তারা একটা অবৈধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দলদাস দালাল শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এরপরও এক একটা নিয়োগে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নেয়া হচ্ছে। চাকরি পেয়েই এই নিয়োগপ্রাপ্তরা ঘুষ-দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে যাচ্ছেন। হাসপাতালসহ বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানেরও চিত্র একই। ফলে কোথাও কোন পাবলিক সার্ভিস নেই। বিচারালয়ে বিচার নেই, হাসপাতালে চিকিৎসা নেই, এলাকায় শান্তি নেই, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিজেই 'কন্ট্রাক্ট কিলার'; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে অনেক আগেই, সরকারের তাবেদারদের নিয়োগ ও নিয়োগ বাণিজ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মহত্ত্বকেই কলংকিত করেছে। টাকা দিয়ে নিয়োগপ্রাপ্তরা চাকরি পেয়ে সেই টাকা দ্রুত উত্তোলনের জন্য মনযোগী হন। ফলে শিক্ষক থেকে শুরু করে কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলেই সকল রকম নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে হয়ে পড়েন ব্যবসায়ী। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনকে ঘিরে যে কাণ্ড হয়ে গেল তাতে আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা যে তারা ক্ষমতার জন্য কী করতে পারেন। এই বিদ্যাপীঠের এগারো শতাধিক শিক্ষক ৩০ ডিসেম্বরের কারচুপির নির্বাচনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান একযোগে ভেঙে পড়েছে। কোন জবাবদিহিতা কোথাও নেই, নেই ন্যায়বিচার। মানুষ একদিকে প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর আস্থা হারাচ্ছে। সে জানে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া নেই, হাসপাতালে চিকিৎসা নেই– কোথাও গিয়ে সে মানুষের অধিকার নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তার টাকা কিংবা ক্ষমতার জোর থাকলে সবই তার হবে। তখন মানুষ জীবন যাপনের জন্য আর কোনদিকে তাকানোর সময় পায় না। অর্থ উপার্জনই তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়। এ করতে গিয়ে নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধ বিসর্জন দিচ্ছে অনেকে। সামাজিক সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে। মানুষ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে মনে করছে সবাই তাকে ঠকিয়ে নিচ্ছে। সবাই ধান্ধাবাজ।

ফলে ন্যূনতম সন্দেহে সে ক্ষিপ্ত হচ্ছে। নালিশ করলে বিচার পাবে না জেনে নিজেই শাস্তি দিতে যাচ্ছে। আবার ধর্ম-বর্ণ-জাত-বিভেদ-ধনী-গরীব এসকল সামাজিক বিভক্তিকে কেন্দ্র করে যে ধরনের রাগ-ঘৃণা মানুষের মধ্যে কাজ করে, সেগুলোও কোন একটা ভুল সন্দেহ কিংবা উত্তেজনা কিংবা ক্ষোভকে উপলক্ষ করে ভয়ংকর পরিণতির দিকে মোড় নিচ্ছে। এই পুরোটাই একটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সামাজিক ফলাফল।

আর্থসামাজিক ব্যবস্থাটি কেমন আমাদের দেশে

আমাদের দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এটি একটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এখানে লাভের জন্য, মুনাফার জন্য দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। বড় বড় শিল্পপতি-পুঁজিপতিরা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এককথায় গোটা দেশ নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের উদগ্র মুনাফা লাভের বাসনায় তারা মানুষ বলে দেশে কিছু রাখছে না। কয়েকটি বড় বড় কর্পোরেট হাউজ দেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে, সুন্দরবন থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংস করছে। এই শোষণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালাতে গিয়ে যা তারা যা করছে তার পরিণতিই হচ্ছে আমাদের বর্তমানের এই সমাজ। অনেকে বলেন, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্যান্য দেশেও আছে, সব জায়গায় তো এরকম বিশৃঙ্খলা, শোষণ, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা নেই। বাস্তবে তারা ওই ব্যবস্থাগুলোর গভীরে ঢোকেননি। বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সারা পৃথিবীর সম্পদ লুটে নিয়ে তাদের দেশে জড়ো করে। ফলে তাদের কাড়াকাড়ির চরিত্র আমাদের মতো নয়। কিন্তু যেহেতু এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই অস্থিরতা এবং পুঁজিপতিদের নিজেদের অর্জিত মুনাফা আরেকদিকে তাদেরই কবর খোঁড়ে– তাই এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর দাঁড়ানো সমাজ কখনই বিকাশমান কোন সমাজ হতে পারে না। আমেরিকার স্কুলে ও রাস্তাঘাটে 'মাস শুটিং', ইংল্যান্ডে অল্প বয়সেই গর্ভবতী হয়ে পড়ার জন্য স্কুলে স্কুলে 'অ্যাবরশন সেন্টার' চালু করা– এসব ঘটনা সেসব দেশের কোন সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার চিত্র আমাদের দেয় না। ফলে এই অস্থিরতা, এই দূরত্ব, এই নিষ্ঠুরতা, এই একাকীত্ব– একটা কারণের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা হলো 'পুঁজিবাদ'। সামাজিক-পারিবারিক সংকট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

এই প্রবল ক্ষয়ের স্রোত ঠেকাতে হলে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সকলকে সামিল হতেই হবে। দেশে দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে, নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসাবে উপস্থাপনের বিরুদ্ধে, নাটক-সিনেমা-বিজ্ঞাপনে-সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রচারের বিরুদ্ধে, ধনীগরীবের বৈষম্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সকলকে একযোগে রাস্তায় নামতে হবে। এ না হলে বিবেক মনুষ্যত্বের এই উথালপাতাল ভাঙন রোধ করা যাবে না। পৃথিবী আর মানুষের থাকবে না। বিদ্রোহই এ বিকৃতিকে রুখতে পারে, বিদ্রোহই এ সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব কাটাতে পারে।

ফ্যাসিবাদ ও সংস্কৃতি

নিয়মকে সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসাবে দেখতে অস্বীকার করে এবং তার পরিবর্তে শ্রেণীসংহতি ও শ্রেণী সমন্বয়ের তত্ত্বকে সৃষ্টি করে। এইভাবে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতিতে প্রাধান্য পায় শ্রেণীবহির্ভূত অথবা শ্রেণীউর্ধ্ব চিন্তাভাবনা।

জাতীয় উন্মাদনা সর্বদাই বুর্জোয়াদের হাতে একটি শক্তিশালী অস্ত্র–যার দ্বারা তারা জনমানসকে শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলে। ফ্যাসিস্টরা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়ারা যে প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ প্রচার করে, তা এবং জনসাধারণের দেশপ্রেম, এ দু'টি এক জিনিস নয়। বিষয়বস্তু ও চরিত্র, দু'দিক থেকেই এরা ভিন্ন। জনসাধারণের দেশপ্রেমের সঙ্গে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের কোন বিরোধ নেই, বরং বর্তমান যুগে কেউই প্রকৃত দেশপ্রেমী হতে পারে না, যদি না সে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয় জাতীয়তাবাদ সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। তাছাড়া যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বিশ্ব বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনমাত্র এবং মানুষের দেশপ্রেমের আবেগকে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে শোষকের হাতে হাতিয়ার, সেখানে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত দেশপ্রেমের ধারণা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে শোষিত জনগণের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। যেখানে সমাজপ্রগতির পথে বাধা যে পুরাতন-পচাগলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থান্বেষী বুর্জোয়া উদ্দেশ্য থেকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ উদ্ভূত হয়, সেখানে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে বলীয়ান দেশপ্রেম মানুষের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার উৎস থেকে উৎসারিত হয় এবং সমাজপ্রগতির পথে সমস্ত বাধাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আতএব ফ্যাসিবাদ মানুষের প্রকৃত দেশপ্রেমের অনুভূতিকে সহ্য করতে পারে না।

শ্রেণীসংহতি, শ্রেণীঐক্য, শ্রেণীউর্ধ্ব জাতীয় স্বার্থের যে ধারণাকে ফ্যাসিবাদীরা প্রচার করে, সাধারণ মানুষের সামনে তাকে তারা এক বিশেষীকৃত রূপে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করে। তাই ফ্যাসিবাদ কখনও কখনও অতিমানবের ধারণার প্রচার করে, যে অতিমানব হচ্ছে জাতীয় ইচ্ছা ও স্বার্থের মূর্তরূপ। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, পুঁজিবাদ তার অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্বে যে ঈশ্বরচিন্তা ও মায়াবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল, আজ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার দিকেই আবার ঝুঁকছে এবং তাকে অবলম্বন করেই টিকে থাকার চেষ্টা করছে।

[সংগৃহীত: *শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০ আগস্ট ২০১৬; এসইউসিআই (কমিউনিস্ট), কলকাতা; পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭]

কমরেড রানু

তুলেছিলেন, প্রিয় কমরেড রানু ভাই হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সকল সিদ্ধান্ত দলের সাথে পরামর্শ করে নিতেন। যেখানে যেতেন তাঁর সাথে একটা কাপড়ের ব্যাগ থাকতো। সেই ব্যাগে পার্টির প্রকাশনা, চাঁদার রশিদ, সাম্যবাদ রাখতেন। বন্ধু-বান্ধব ও জনগণের সাথে নানা আলোচনার ফাঁকে এসব দিতেন। তত্ত্বকথা কম জানলেও নিজের মত করে কৃষক জীবনের সীমাহীন দুর্দশা, গরীব মানুষের সংকট, কষ্ট, তার কারণ এসব নিয়ে কথা বলতেন। এভাবে অনেককে তিনি দলের সাথে যুক্ত করেছেন। কৃষকের গান গায় যে অন্ধ বাউল সন্তোষ কুমার বর্মণ, সে তাঁর মাধ্যমেই দলে সাথে যুক্ত।

আমাদের দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে এদেশের মাটিতে উচ্চ হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তুলতে চায়। কমরেড রানু সেই সংগ্রাম আমৃত্যু করেছেন। কমরেডরা সবসময় তাঁর স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ পেয়েছেন। তিনি প্রতিদিনিই কমরেডদের খোঁজ-খবর রাখতেন। অসুস্থতার খবরে ছুটে যেতেন। তাঁর সময়জ্ঞান নিয়ে কমরেডরা সমালোচনা করতো, এসব সমালোচনা তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন– তা দূর করার সংগ্রাম করেছেন। এমন নিষ্ঠাবান, নিবেদিতপ্রাণ সংগঠকের শূন্যতা অনেকদিন পূরণ হওয়ার নয়। কমরেড রানু আমাদের সকলের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন। বেঁচে থাকবেন আমাদের শোষণ মুক্তির লড়াইয়ে।

কমরেড মোজাহেদুল ইসলাম রানু লাল সালাম।

সাম্যবাদ

শেষ পৃষ্ঠা

সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

আগস্ট ২০১৯

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে গাইবান্ধার গিদারী ইউনিয়নে ত্রাণ বিতরণ

নেতাকর্মীরা ত্রাণ বিতরণের জন্য প্যাকেট তৈরিতে ব্যস্ত

জনগণের অর্থ দিয়েই গড়ে উঠেছে বাসদ (মার্কসবাদী)'র ত্রাণ তহবিল

গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, রংপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, চাঁদপুর, ঢাকা, সিলেট, গাজীপুরসহ সারা দেশে সমস্ত শ্রেণীপেশার মানুষের কাছে বাসদ (মার্কসবাদী)'র কর্মীরা বানভাসি মানুষের জন্য গণচাঁদা সংগ্রহ করেন। উত্তরাঞ্চলে তহবিল সংগ্রহের সময় ধানসহ অন্যান্য কৃষিফসল জনগণ তহবিলে দেয়। মানুষের প্রতি দরদ ও দায় থেকে জনগণের এ অংশগ্রহণ প্রমাণ করে সবাই আত্মকেন্দ্রিকতায় নিমজ্জিত হয়নি। পার্টির গণসংগঠনসমূহ বিভিন্ন এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ সংগ্রহ করে।

বানভাসিদের অর্থেই তহবিল

গ্রামে যাদের সারা বছর কাজ থাকে না তাদের অনেকেই ঢাকায় ভাসমান শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এরা কেউ হকার, রিক্সা শ্রমিক, চা বা পান দোকানদার, ফেরীওয়ালা, গার্মেন্টস শ্রমিক, গৃহপরিচারিকা, ট্যাক্সিচালক, ড্রাইভারসহ নানা পেশায় নিয়োজিত। অনেকেই সংসার চালাতে ঢাকায় থাকেন। গণচাঁদা সংগ্রহ করতে গিয়ে আব্দুল রউফ নামের একজন গামছা বিক্রেতা এগিয়ে এসে সহযোগিতা করেন। তারপর বলেন, "আমার এলাকা, আমার ঘর পানির নীচে।" একজন ফল বিক্রেতা বলেন, "আমরা বুঝি বানের জলে বলদ ডুবলে, ক্ষেত ডুবলে দেশের কী ক্ষতি! কিন্তু বড় বড় মন্ত্রী মিনিস্টাররা বোঝে না।" ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বাসদ (মার্কসবাদী)'র ত্রাণ তহবিলে সহযোগিতা করেছে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছে বানভাসি এ ভাসমান শ্রমিক।

ত্রাণ বিতরণ তৎপরতা

গাইবান্ধার বাদিয়াখালির চিনিয়াকান্দি ও সরকারতারি, সুন্দরগঞ্জে চরখোদ্দা, কামারজানিতে বিভিন্ন পাড়ায়, বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। বোয়ালি ইউনিয়নে, খেয়াঘাট বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত

ময়মনসিংহে ত্রাণ সংগ্রহ

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। পার্টির গণসংগঠনের উদ্যোগে সদরে গাইবান্ধা সরকারি কলেজের আশ্রয় নেয়া বানভাসিদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়। এছাড়া সদরের কলেজপাড়া, মাঝিপাড়া, গিদরী ইউনিয়নের বিভিন্ন পাড়ায় ত্রাণ বতিরণ করা হয়। বাদিয়াখালি এলাকায় ছাত্রদের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়। বগুড়ার ধুনটে ভাণ্ডারবাড়ি ইউনিয়নে বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে চাল,ডাল ও আলু বিতরণ করা হয়। কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারির পর্ত্তিমারি ইউনিয়নে বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। পার্টির রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে কুড়িগ্রামের ধরলাপাড়ের বানভাসিদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ময়মনসিংহ জেলা পার্টির উদ্যোগে অষ্টধার গ্রামে বন্যাদুর্গত মানুষকে সহযোগিতা করা হয়। বানভাসি মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয় সাহসের সাথে মোকাবেলা করে। ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের জীবন সংগ্রামের অংশীদার হচ্ছে সমস্ত নেতা-কর্মীবৃন্দ। পার্টি ও গণ সংগঠনের ত্রাণ তৎপরতা এখনও অব্যাহত আছে। যদিও বন্যা কবলিত অঞ্চলে সরকারি অপ্রতুল বরাদ্দ ও বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি মানুষ অসহায়। এই বানভাসি মানুষের দাবি পুনর্বাসন, বন্যা ও নদী ভাঙনের স্থায়ী সমাধান। পর্যাপ্ত ত্রাণ ও ফসলের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ ভর্তুকি। গাইবান্ধা জেলায় ২১ জুলাই দুপুর ১২ টায় এ দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে শহরে সমাবেশ ও মিছিল করে। ৩ আগস্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক সরবরাহ এবং ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তা, ব্রীজ, বাঁধ মেরামতের দাবিতে পার্টি বগুড়া জেলা শাখা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

বগুড়ার ধুনটে ভাণ্ডারবাড়ি ইউনিয়নে পার্টির ত্রাণ বিতরণ

২১ জুলাই দুপুর ১২ টা : গাইবান্ধা শহর বন্যা ও নদী ভাঙনের স্থায়ী সমাধান এবং বন্যার্তদের পুনর্বাসন, পর্যাপ্ত ত্রাণ সরবরাহ, আক্রান্ত অঞ্চলকে দুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবিতে পার্টির কর্মসূচি

সন্দেহ, নিষ্ঠুরতা, ভয়

আমাদের বদলে যাওয়া সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

একটা কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে–মানুষের মন পাল্টে যাচ্ছে। মানুষকে এখন চেনা যায় না, বোঝা যায় না। বেশ কিছুদিন ধরে দেশে যেসকল ঘটনা ঘটছে, তাতে এ দেশটাকে চিনতে খুব কষ্ট হয়। আমরা মূল্যবৃদ্ধির কথা বলছিনা; বন্যা, খরা কিংবা ডেঙ্গুর কথাও নয়। যে সংকটের কথা আমরা বলতে চাই, তার উৎস মানব মনের অনেক গভীরে। টাকার অভাব মানুষের জীবনযাপনে অনেক কষ্ট তৈরি করে ঠিক, কিন্তু মানবিক সংকট সমাজের সামাজিক সত্তাকে ভেতর থেকে মেরে দেয়। যৌথকে ব্যক্তি করে, সকল নির্মল ভালোবাসাকে নিয়ে যায় স্বার্থের চোরাগলিতে।

কী সেই মানবিক সংকট? আমরা এই সময়ের পত্রিকার খবরগুলোর দিকে তাকাই। বেশ কিছু নৃশংস ঘটনা আমাদের ভাবাবে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কোমল ব্যাপার নয়, এগুলো সবসময় নৃশংসই হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে তার সংঘটন প্রক্রিয়া দেখলে চমকে উঠতে হয়। আবার প্রতিদিন সমাজের মানুষের পারস্পরিক আদান-প্রদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেকটি ব্যক্তির সামাজিক মানুষ হিসেবে যে ভূমিকাটা থাকে, তা প্রতিনিয়ত কমছে। সামাজিক মানুষ ক্রমেই ব্যক্তি মানুষ হয়ে উঠছে, সামাজিক দায় বলে তার মধ্যে কোনো বোধ কাজ করছে না। অথচ সমাজ ছাড়া ব্যক্তির আলাদা কোনো অস্তিত্ব ভাবাই যায় না। আমাদের এ অঞ্চলের রয়েছে দীর্ঘদিনের সহযোগিতার সংস্কৃতি। যে নতুন সমাজ এখন আমরা দেশে জন্মাতে দেখছি, তার সাথে আমাদের অতীত ধারাবাহিকতা যেন মেলে না।

যা হওয়ার কথা ছিল, আর যা হলো!

সাধারণভাবে কথাগুলো না বলে আমরা ঘটনায় যাই। গত ২৬ জুন বরগুনা শহরে বরগুনা সরকারি কলেজের প্রধান ফটকের সামনে রিফাত শরীফকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এই হত্যার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসেছে। সংঘবদ্ধভাবে তাকে কোপানো হয়েছে শত মানুষের সামনে জনাকীর্ণ একটি রাস্তায়। মানুষ দাঁড়িয়ে দেখেছে, ভিডিও করেছে–কেউ এগিয়ে যেতে সাহস করেনি। পত্রিকায় এসেছে দু'একজন তারপরও সাহস করেছিলেন, কিন্তু ঘাতকরা তা গ্রাহ্য করেনি। যারা মেরেছে তাদের ● ৭ এর পাতায় দেখুন

পাটকলের শ্রমিক

আবারও নামতে হবে রাস্তায়

পাটকলশ্রমিকরা কারখানা ছেড়ে রাস্তায় নামলেন গত মে মাসে, ঈদের আগে। মজুরি কমিশন, বকেয়া মজুরিসহ ৯ দফা দাবিতে গত ২ এপ্রিল থেকে ৭২ ঘণ্টা ধর্মঘট পালন করেন তারা, একইসঙ্গে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করেন। এরপর ১৫ এপ্রিল থেকে তারা ৯৬ ঘণ্টার ধর্মঘট, সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন। ১৫ এপ্রিল রাতে শ্রম প্রতিমন্ত্রী ও বিজেএমসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকের পর তাদের আশ্বাসে শ্রমিকরা কর্মসূচি স্থগিত করেন। শ্রমিকদের আন্দোলনের চাপে ঈদের আগে সরকার বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন। কিন্তু শ্রমিকদের দাবি পূরণ হয়েছে কি? তাদের কি আর এই দাবিগুলোকে কেন্দ্র করে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে না? সরকার কি সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

মজুরি কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিয়ে কোন কথা নেই সরকারের

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এ বাজারে রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকলের শ্রমিকদের মজুরি মাত্র ৪২০০ টাকা। অথচ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সেই ২০১৫ সালেই সরকারি পাটকলের শ্রমিকদের জন্য মজুরি কমিশন ৮৪০০ টাকা মজুরির ঘোষণা দিয়েছিল। এরপর চার বছর কেটে গেল, সরকার কথা রাখেনি। এবারের আন্দোলনে তাই বকেয়া বেতনের সাথে মজুরি কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দাবি উঠেছিল। ঈদের আগে সরকার সব দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিলেও বাস্তবে তা ছিল বকেয়া বেতন পরিশোধ করে শ্রমিকদের বাড়ি পাঠানোর নাটকমাত্র। সে কারণে ঈদের পর এই মজুরি কমিশন নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কথা নেই। কর্তৃপক্ষের দিক থেকে বরা হচ্ছে, শুধুমাত্র খুলনার ৯টি সরকারি পাটকলে সাপ্তাহিক মজুরি ৪ কোটি ১৮ লাখ টাকা। মজুরি কমিশন কার্যকর হলে মজুরি হবে প্রায় দ্বিগুণ। এ ছাড়া মজুরি কমিশনের ৪ বছরের এরিয়ার জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। এ টাকা কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে কর্মকর্তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ৯টি পাটকলে গড়ে বছরে লোকসান হচ্ছে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। বর্তমানে ৩০০ কোটি টাকা মূল্যের ৩২ হাজার ৩৮৭ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য বিক্রির অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। সে কারণে সময়মতো মজুরি দিতে পারছেন না কর্মকর্তারা, মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন কিভাবে করবেন তা নিয়েও তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

সত্যিই কি বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা কমে গেছে? সত্যিই কি বিক্রি করতে না পারার কারণে লোকসানে আছে ● ২ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক: **শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী,** বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা–১০০০ থেকে প্রকাশিত। ফোন ও ফ্যাক্স–৯৫৭৬৩৭৩।
ওয়েবসাইট : www.spbm.org; ই–মেইল : mail@spbm.org